SNAN KARO PURNAKUMBHE

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রকাশক : নিতাই দাস
'অমৃত ধারা'-র পক্ষে
৮, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক : দি মুদ্রণী
১৩১ এ, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট
ক'লকাতা-৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ ব্লক ও মুদ্রণ : প্রসেস এণ্ড প্রিন্ট প্রাইভেট লিমিটেড
৫ ব্লকম্যান ষ্ট্রিট, ক'লকাতা-১৩

কবিতা সংগ্রহের প্রথম কবিতা ‘উৎসর্গ’
যাকে উৎসর্গ করা হয়েছিল তাঁকেই

মুখবন্ধ

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার ছড়াছড়ি। ফলতঃ বইয়েরও অভাব বরং ক্রেতার। তবুও বাংলা কবিতার বই বাণিজ্য মুখাপেক্ষী হয়ে প্রকাশ হওয়ার থেকে কবির তাগিদেই বের হয় বেশী। তবে ব্যতিক্রমও আছে বৈকি। পড়বেন পাঠককুল, কিনবেনও তাঁরা। আর তাঁদের কেনার উপরেই নির্ভর করবে কবির অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা। বই-পাড়ায় এক ঝলক চোখ বোলালে কিংবা বই মেলায় ঘুরলে মনে হতেই পারে, অন্তত বাংলা কবিতা বা কাব্য গ্রন্থের প্রকাশ বাণিজ্য নির্ভর নয়। এটুকুই বাঁচোয়া। আবার এটাও ঠিক, কোন রকমে বই বের করার প্রবণতা এতে বেশী এসে যায়। সে যাই হোক, কবিতা ছাপার অক্ষরে, বাঁধাইয়ের মোড়কে, ল্যামিনেশনের আধুনিকতায় প্রকাশ হোক, এ বেশীরভাগ কবির আন্তরিক ইচ্ছা।

বন্ধু বান্ধবের সনির্বন্ধ অনুরোধ ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় ' স্নান করো পূর্ণকুম্ভে ' গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ লাভের সুযোগ পেল। এঁদের সবার অনুরোধ ও প্রচেষ্টা প্রকাশকের আগ্রহের জন্যে কবির তরফ থেকে তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

যদিও কবিতার সাথে চিঠির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক খুঁজে বের করা একটু কষ্টকল্পনা যদি না চিঠি নিজেই কবিতার আকারে হয়, তবুও নিজের মনের ভাবকে কবিতার মত সুললিত বেশে প্রকাশ করতে পারলে চিঠিও কাব্যরূপ ধারণ করতে পারে, বেশ-ভূষায়-অলংকরণে মৌলিক প্রভেদ থাকলেও, নিজের মনের ভাবকে বিভিন্ন সময়ে গদ্যের আকারে পাতার পর পাতা লিখে জমিয়ে রেখেছেন। এক বিশেষ গুণগ্রাহীর সনির্বন্ধ অনুরোধে কিছুটা কাটা-ছেঁড়া করে এই বইয়ের দ্বিতীয় অংশে সেগুলো প্রকাশ করলাম। প্রথাগত ব্যাকরণকে উল্লঙ্ঘন করার জন্যে সুধীজনের মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পাওয়া গেল কি না এ বিচার পাঠকের।

রবীন্দ্রনাথ ' চিঠি '-কে তুলনা করেছেন সুন্দর ছোট্ট মালতী ফুলের সাথে। তবে কিনা, এটির প্রেক্ষাপট, পটভূমিকা বিশাল। তাঁরই কথায়, ' কিন্তু সেই চিঠি যে আকাশের মধ্যে ফুটে ওঠে সেই আকাশ মালতীলতার মতোই বড়ো।' কোন সাহিত্যিক বা কবির লেখা যেমন তাঁর ব্যক্তিসত্ত্বা, সমাজ সচেতনতা, সামাজিক প্রেক্ষাপট বা কোন বিশেষ সময়ের অনুভূতির পরিচয় বহন করে, তেমনি চিঠিও বহন করে পত্রদাতার বিভিন্ন মানসিক অনুভূতি। সময়ের পটভূমিতে এবং ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশ ও পরিবর্তনের সাথে সাথে চিঠির বক্তব্য বিষয় পরিবর্তিত হয়। যেহেতু চিঠির মূল উদ্দেশ্য যোগাযোগ, যা নিহিত ভাবেই নির্দেশ করে বিনিময়—ভাবের মতের কিংবা উত্তর-প্রত্যুত্তরের, তাই পিঠোপিঠি চিঠি অনেক কিছুর সাক্ষ্য বহন করে। আবার সময়ে সময়ে এমন চিঠিও লেখা হয় যা ঠিক প্রাপককে দেওয়ার জন্যে লেখা হয় না, লেখা হয় মনের অনেক কথা গুছিয়ে বলার জন্যে যা হয়তো ঠিকমত বলে ওঠা যাচ্ছে না কিন্তু আবার মনের মধ্যে চেপে রাখতেও কষ্ট বোধ হচ্ছে। এধরণের চিঠি হয়তো বা কিছুটা নিজের সাথেই নিজে কথা বলা। ফলতঃ এসব চিঠির ব্যাপ্তি অনেকটা পরিধি জুড়ে এবং এরা স্বভাবতই হৃদয়গ্রাহী, মর্মস্পর্শী। আনুষ্ঠানিক চিঠি মোটামুটি জানতে চাওয়া, জানা ও জানানোর মধ্যে সীমিত থাকে। আর যেসব চিঠি আনুষ্ঠানিকতার ধার দিয়ে যাতায়াত করে না তাদের মধ্যে অনেক সময়ই এমন এমন বিষয়ের অবতারণা হয় যা আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু লেখক ও উদ্দেশিত ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক এক বিরাট প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আসে এবং এই প্রাসঙ্গিকতা বিচার করতে ঘটনা পরম্পরা প্রায়শই বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে অনুভূত হয় না। আপন মাধুর্যে পরম্পরা প্রকাশিত হওয়ার পথে কোন বাধা থাকে না।

বর্তমান গ্রন্থটির প্রথম পর্বে কিছু কবিতা প্রকাশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্ব কিন্তু কিছু চিঠির অংশবিশেষ। কাকে লেখা হয়েছে, কখন এবং কি পটভূমিতে তা কয়েকটি সঙ্গত কারণে প্রকাশ করা হলো না। যদিও এটা অনস্বীকার্য, পত্রসাহিত্য প্রকাশ করতে

গেলে তাতে কোন রকম সম্পাদনা অনভিপ্রেত। আবার এটাও সমভাবে সত্যি, চিঠির বিভিন্ন সময়ের আবেগ একান্তভাবেই ব্যক্তি-গত। তা ছাপার অক্ষরে অন্যের পাঠের জন্য প্রকাশ করা হলে যেমন ব্যক্তিগত গোপনীয়তার সলাজ আবরণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, তেমনিই অনেক পাঠক ভ্রূ কুঞ্চিত করতে পারেন, কখনও বা শব্দসংযোজনকে অশালীনতার দোষে দুষ্ট করতে পারেন। যেসব লেখক বা কবি 'বিখ্যাত' কথাটির পরিধির মধ্যে পৌঁছে গেছেন, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁদের ক্ষেত্রে এসব হলো, আর্ষ-প্রয়োগ। লেখার ক্ষেত্রে নিজের সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা করে অনেক কিছুই সম্পাদনা করতে হয়েছে। এই অংশের চিঠিগুলি পত্রসাহিত্যের আকারে সাজানো হয়ে থাকলেও, একে 'বলতে চাওয়া মনের কথা' হিসেবে ভাবাই ভালো। তাই এ কথা নয়, কথকতা।

প্রসঙ্গত, এ চিঠির ধারাবাহিকতা চলছে। চলবে আমার শক্ত হাত অশক্ত না হওয়া পর্যন্তই। কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বও একই। পরবর্তী-কালে এরকম চলমান পত্র আরও প্রকাশ করার ইচ্ছে রইল।

এতে আছে

কবিতা	পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় খণ্ড

★ – ★ – ★ – ★

উৎসর্গ

নবাঙ্কুর তৃণরূপে জন্মিলে আবার
ছয় ঋতুর কালক্ষেপে।
সময়ের নটরাজ
আবর্তিল বিশ্রামবিহীন কর্মে,
নাই কোন উপহার, নাই কোন দীর্ঘশ্বাস
শুধু সতর্ক সে শিহরণ
পূর্ণ করে তব পাত্র
ক্ষণে ক্ষণে, উপেক্ষিত রোমাঞ্চে।

রিপুর আকর্ষণ
পরাভব মানে দুর্নিবার হৃদয়ের টানে,
ভ্রুক্ষেপ, সন্দেহ, ঈর্ষা
হিংসা কিংবা দ্বেষ
উত্তীর্ণ হোক আজি, তব নব দ্বিজত্বে
কালের হৃদয় হতে চুরি করা একটু সময়
ভাগাভাগি করে নাও চলমানের সাথে।

ভাঙাগড়া তুচ্ছ করি
তুচ্ছ করি ওঠা পড়া
জীবন মৃত্যুর
গহন অরণ্যে করি শুধু নর্মদার চর্চা।
নিস্তব্ধ নৈঃশব্দে অপেক্ষমান সৃষ্টি
অসীম কৌতূহলে
ফিরে পাওয়া অকৃত্রিম 'মিষ্টি'-র
গর্বের শোণিতে।

চর্চিত রক্তের শোভা অচর্চিত হাতে
অঙ্গুলি লেহনে
মিলে-মিশে একাকার জ্যোতিষের গণ্ডীতে,
শূন্য হতে ছিঁড়ে নেওয়া
অমরাবতীর পুষ্পবৃন্তে, কিংবা
অন্য কোন গ্রহ তারকার
এক সুনির্দিষ্ট সজ্জাতে।

মনের মত

সংকীর্ণ, সংক্ষিপ্ত পৃথিবী। স্থান অকুলান।
বেঁচে থাকার মতো জায়গা চাই।
কখনও মানুষের, কখনও জাতির, কখনও দেশের।
চলন্ত ইতিহাস তাই শতাব্দীর রূপরেখায়
বারে বারে জন্ম দেয় তাকে। সে আকাঙ্খা।
বংশ থেকে ব্যক্তি, ব্যক্তি থেকে সমষ্টি—
উত্তরণ তবু থেকে থেকে থমকে যায়।
তখনই আসে একটা বড় 'কিন্তু',
প্রশ্ন জাগে, কোনটা ঠিক?
কাঠামো—না ইচ্ছার রূপ?
নিজের আদর্শ নিয়ে চলা—না অন্যকেও আদর্শে
আনা
সংঘাত তাই, সংঘাত আদর্শে, সংঘাত রূপায়ণে।
ডারউইনের বিবর্তনে শক্তিশালীর বেঁচে থাকার তত্ত্ব
মানুষে এসেও শেষ হয় নি।
আত্মরক্ষার তাগিদ থেকে আক্রমণের অস্ত্র।
মহাকাশ থেকে ভেসে আসা শ্যেনের আক্রমণ।
প্রকৃতি ব্যর্থ। প্রকৃতি নিংড়ে, উপাদান বেছে
মানুষই আজ তৈরী করুক কৃত্রিম মন।
প্রতিযোগিতা নয়. শুধু বেঁচে থাকাতেই যার
পূর্ণতা ও প্রাপ্তি।

এখন স্মৃতিতে

অবকাশের মুহূর্তে
সাদা পায়রা ঠুকরে দেখে
অন্যের ফেলে রাখা, তার দিনের সঞ্চয়।
শিকারীর অব্যর্থ সাফল্য
আকাশের গায়ে এঁকে রাখে অসম রামধনু।
উঠে যাওয়া রংয়ের শূন্যস্থান
প্রকৃতি আর বিজ্ঞান পূর্ণ করে বংশগতি দিয়ে
বৃষ্টির কলতান মুছে দেয় শিশিরের নৈঃশব্দ্য।
বটের আঠার মত রাত্রির অবকাশ
পাখির মত জীবন্ত করে তোলে দানাদার কে।

দিনের সংগ্রামের ক্লান্তি এখন স্মৃতিতে।
প্রবাদের রত্নাকর এখন কবি বাল্মীকি।
নিষাদের রূপান্তর কবিত্বে চৌকাঠের
এপার-ওপার জীবন আর পরিণতি।
চোখের জলের মধ্যে সূর্য্যের আলোর
ভেঙে যাওয়া ; সংশ্লেষণ বর্ণালীর ছটায়।

সেতুবন্ধ

ভীরু, পলাতকের মত যেতে চাইনি—
চেয়েছিলাম বীরের মত
মাথা উঁচু করে যেতে।
কখনও-না-পারার বেদনাটা
ভুলতে চেয়েছিলাম।
ভবিষ্যতের আশায়
অথবা উদ্‌ভ্রান্তের মত
হাসপাতালের রুগীর অসহায় অভিভাবক
হয়েছিলাম আমি।
আমি রক্ত চাই
কালোবাজারীর কাছে কেনা
এইড্‌সের রক্ত যদি হয় তাও।
দড়ির গিঁটটা সন্ধ্যের আগেই খোলা দরকার
যাওয়ার সময়
দেওয়ালে অনেকদিন আগে লাগানো
পর্যটন দপ্তরের গণ্ডারটা
শিশুর অতিক্রম করে আসা
চপলতা হলেও ফেলতে পারিনি।
হাতে পেয়েই নতুন খেলা ছেড়ে
সেটাকে আবার দেওয়ালে সাঁটতে বসল।

প্রকাশের আগে

প্রকাশের আগে দেখো না এটা
দেখো না, উৎসর্গ করার আগে।
সময়ের উল্লেখ না করে মুদ্রিত
হবে, পৌঁছে দেব একে
প্রকাশক ছাড়াই।

ময়দানের একরাশ উজ্জ্বলতা
আর প্রেক্ষাগৃহের নিস্তব্ধতা
হাঁটি হাঁটি করে পৌঁছে যাবে
মোটে একটা ফুল-বিছানো শয্যায়।

দেওয়ালে কোয়ার্টজ, লজ্জা দেয়
পুরোনো পেণ্ডুলামকে
পাঁচ মিটারের কাপড় রূপ নেয় সেলাই হয়ে,
পরিবর্তনের আনন্দ সর্বাঙ্গে।

কপালে পূর্ণিমার চাঁদের নীচে
ছোট্ট একটুকরো তারা
চেয়ে থাকে, চেয়ে থাকায়,
শুধু হাঁটলেই পৌঁছে যাওয়া যায় না—
ঋতুবন্ধের বিজ্ঞাপন থেকে সাত মিনিট দূরে হলেও।

শকুনের দৃষ্টির মাঝে
স্থৈর্য্য চঞ্চল হয়
মাধ্যাকর্ষণের টানে চোখ নামে
গভীরে, অনেক অনেক পাতালের মাঝে।

দশমাস পরে

অতবড় জাহাজটাকে এতটুকু নৌকো
টেনে আনে মোহানায়।
সাতটা সমুদ্র আর তেরোটা নদী নয়—
শুধু একটা করে পার হতে হবে।
চুঙিবাবুর চোঙা মূল ভূখণ্ড থেকে
বেরোনোর পথের দিশারী।
ঘননীল যেখানে ফিকে হবে
সেখান থেকে বাতিঘরের আলো—
পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে
মুক্তিকামীদের ব্যবহৃত কক্ষে।
আজ সে জাতীয় স্মারক।
অন্য কয়েদগুলোও ফাঁকা করে দিতে চাই।
লক্ষ্মীর শঙ্খ প্রবালের আকারে খেলা করে
ভগবানের তুলির টানের তিনশোটায়।
আমাকে যেতেই হবে মাঝির পিছুটানকে উপেক্ষা করে
রমণীর আকাঙ্খা সেদিন সহজিয়ার ঈশ্বরপ্রীতি,
মূলের সাথে কাণ্ডের যোগ,
আদিমতার সাথে সভ্যতার।

দশমাস পরে ফিরতে চাইলেও পারব না
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আমি
সভ্যতা বাড়বে সেখানে আদিমতার আলিঙ্গনে।

নতুন জন্ম

পিছনে ফেলে আসা অনেকগুলো ঘুম যোগ করে-
একটা দীর্ঘনিদ্রা ;
কতকগুলো শ্রম যোগ করে এক দীর্ঘশ্রম—
সাথে নিয়ে বিশ্রামের আকাঙ্খা।
বাইরের এক ঝাঁক ধুলো পায়ে বয়ে এনে
বিনম্র অবসাদ, আর, অনেক অনেক তৃষ্ণা।
নূপুরের আওয়াজ উঠে আসে
ছোট্ট বারান্দা দিয়ে, এপারের দিকে।
অমলিন সেই লিপস্টিকের পাপড়ি
আর রেণুর সমর্পণ ;
নিবেদিত উর্ধ্বমুখে
ঘ্রাণ, ঘ্রাণ আর একরাশ ঘ্রাণ।

দেখেছি দু-রকম যোগ
বেড়ে যাওয়া ফল
কখনও হ্যাঁ-এর, কখনও বা না-এর।
তার মাথায় মুকুট
আর আবরণ সর্বঅঙ্গে।
এ আবরণ সনাতনী নয়,
বরং এ আবরণ
লুব্ধ দৃষ্টির আক্রমণ থেকে।
এ বরং এক অলঙ্কার হোক
বড় দেরিতে পাওয়া সেই প্রেমিকের বুকে।
সম্রাজ্ঞী হল না সে
ক্ষমতার আস্বাদনে,
আর অধিকারের গর্বিত ঔদ্ধত্যে।
ধমনীর নীল রক্ত।

স্বপ্ন

স্বপ্নের কবিতা তৈরি করতে গিয়ে
নিজেই কবিতা হয়ে গেল
সেই লোকটা
ঈশ্বরের ভালবাসা নিয়ে
মর্তে আসতে চেয়েছিল সে।
ভালবাসা তখন পার্থেনিয়ামের রেণু।
রক্তাক্ত বরফের উপর দিয়ে
হেঁটে আসা মানুষটা
ক্লান্ত হয়ে বসে
দুপাশে গাছ দিয়ে ভাগ করা
কুমারী পথের সৌন্দর্য
চোখ চেয়ে দেখে।
সে পথে অবগাহনে
পৌরুষের তৃপ্তি।
আকাঙ্খা তবু মাতৃত্বের দূরত্বে।
দূর আকাশে ভগবান রংয়ের পাহাড়
নেশা ধরায়।
মাতাল চালকের গ্লকোমার দৃষ্টি
মুহূর্তে সব দূরত্বের অবসান এনে দেয়।

একটি সমুদ্রের জন্যে

একটি জীবন্ত নীল সমুদ্রের জন্যে
আমার সবকিছু আমি দিতে রাজী আছি।
বেলার বদলে রংয়ের বদল
অথবা বদল ভূগোলের
কিছুই ধরা দেয় না আমার ব্যাখ্যায় ;
অনুসন্ধানে, কিংবা অনেক স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে।
সিদ্ধান্ত ছিল তাই গভীরতা থেকে তুলে আনার
কেবল এক আঁজলা জল
খুঁজে নেওয়ার কৌতূহলে
সেই রংয়ের রসায়ন
আর ফেনার দুর্বোধ্য, অপার্থিব ভাষা।
পরস্পরের হাত ধরে
দামাল ব্রেকারগুলো যখন শৃঙ্খলিত করতে আসে
অন্ধকারের বুক চিরে
জৈব উদ্ভিদের রূপালী বিচ্ছুরণ যখন জন্ম দেয়
ইন্দ্রের সৌন্দর্যের
মুহূর্তের প্রাবল্যে গর্জনের কালো হাঁ।
তখন গিলতে আসে ধর্ষণের উন্মত্ততায়।
পরবর্তী সকালের সূর্যের আক্রোশের সময়
নিরলস উচ্ছ্বাস আর অশান্ত গর্জনের
আকাঙ্ক্ষার মাঝে ধরা দেয়
যুবক যুবতীর আবেগার্ত আকুলতা।
সে ভীষণ তখন মূর্ত অপার বিহ্বলতায়।
বিস্মৃত হয় কামনার আক্ষেপ

গম্ভীর অতলান্তে
বিসর্জিত হই আমি
অবনতমুখী এক স্নিগ্ধ সন্ধ্যা হয়ে।

অভাব একটি সিঁদুরের দাগের,
একটি ঘোমটার,
একটি যৌথ চিত্রের
যার পরিপূর্ণতা একটি তুলতুলে পুতুলের অবয়বে।
অবলুপ্ত হোক তা
বিশ্বের বিন্যাসে, এক সুগভীর তৃপ্তিতে।

হে সমুদ্র, চুরি করে নেওয়া একটু সময়
উপচে উঠুক তোমার চির উচ্ছ্বাসে
ভাগ করে নেওয়া একটু চাপল্যে।
অলকানন্দার তীরের অমরাবতী থেকে
ছিঁড়ে নেওয়া সেই আপেলের সুগন্ধ
শাজাহানের হাতের তালু থেকে উঠে আসুক
রক্তের মাদলে।

রূপ

খোঁজার পালা যখন শেষ
তখন, শান্ত হয়ে ডুব দাও
কালো চুলের ধার ঘেঁসে আটকে থাকা
বুনো নীল অপরাজিতাটার সৌন্দর্য্যে
ওর গন্ধ নেই, শুধু রূপ আছে
তাই তো ও শিবের প্রিয়
এক-রঙা ধুতুরা কিংবা একরঙা কল্‌কে ফুলটার সাথে।
যখন টকটকে (না কি টুকটুকে) লাল জবাটা
দেবী হয়ে ফুটে ওঠে
তখন কি বলো গো তুমি তাকে—
রূপ, না কি অ-রূপ ?

ফর্সা ছেড়ে কালো খুঁজিনি,
চষে বেড়াইনি আধো-ছায়ায় ঘেরা পান পাতা
কিংবা কচি ইপিকাক খুঁজতে ;
চেয়েছিলাম একটা আস্ত মৃগনাভি
কিংবা কস্তুরী
যার গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে
হরিণী নিজেই উদ্বেল হয়
এবং খোঁজে,—শুধুই খোঁজে
সুগন্ধের মুলটিকে।
তখনই চঞ্চল মৃগ সুগভীর তৃপ্তিতে
জানিয়ে দেয়,
তোমার সুগন্ধের উৎস তুমি নিজে।

চাবি

আমার কবিতা স্থাণু হয়ে থাক
অন্তত যতদিন না
তোমার হাতে আবার কলম ধরাতে পারি :
সঙ্গীতের তাল ও লয়—
মৌন হোক
অন্তত যতদিন না
সুন্দর সাড়ে তিন অক্টেভের যন্ত্রটা
তোমার হাতে আবার মুখর হয়ে ওঠে।
কণ্ঠ স্তব্ধ থাক
অন্তত যতক্ষণ না
তোমার স্বরযন্ত্রের কোকিল আবার বসন্তে উদ্বেল হয়
সেদিনের সাক্ষী আমি নই
যেদিন তোমার কলম,
আঙুলের ছন্দিত ভ্রমণ আর সুরেলা কণ্ঠ
একই সাথে বিদ্রোহ করছিল
সমাজ আর অপমানের যন্ত্রণার বিরুদ্ধে।

পুরোনো নথি ঘেঁটে

সেই খুনের মামলাটা আর পড়তে চাই না
প্রিয়জনকে আর লজ্জা দিতে চাও না বলে।
শুধু অংশ দাও
সে দুঃখের
যা আমার প্রিয় প্রজাপতির রঙীন পাখনা দুটোকে
ধর্ষণ করেছে অবিরাম।
অন্তত সেই চাবি পাওয়া পর্যন্ত
হয়তো অপেক্ষা করতে হবে আমাকে
যা তোমার নিজস্ব,
বা দুজনের॥

রূপকার

ভেবেছিলাম, তোমার হয়ে সওয়াল জবাব করব,
তবু কি না, দাঁড়াতে হল কঠিন প্রতিপক্ষ হয়ে,
দীর্ঘ শুনানির পরে
না, বলা কথা থেমে রইল
উত্তরপত্র জমা দিয়ে হাত-কামড়ানো হয়ে
এবার তুই কালো কোটের বিদগ্ধ তর্কের জাল।
তারপর? শুধু ছুঁচ-ফেলা, প্রহর-গোনা অপেক্ষা,
আদালতের নিশ্চুপ কক্ষে এখন শুধু রায়ের প্রতীক্ষা,
জজসাহেব, আটকে রাখো তোমার রায়।
বরং এসো, এসব ছেড়ে একটা ত্রিপাক্ষিক সমাধান খুঁজি।
হারাতে আমার বড় ভয়
লগ্নভ্রষ্টা মেয়ে পরের লগ্ন আর হারাতে চায় না,
হারালে আর ফিরবে না, এতবড় কঠিন সত্যের আশংকায়।

ডাকের জড়তা বুকে করে স্তব্ধ তুমি।
মনের মাঝে সুরের যাতায়াত, তবু যন্ত্র বাদী,
মিষ্টির উত্তরে কেন বৃষ্টি হয়ে ঝড়ে পড়ে না
দেবতার আশিসবাণী, অথবা স্বর্গের ফুলরেণু?
অন্ততঃ চৌকাঠটুকু ডিঙোও। সামনেই বড় রাস্তা।

বসন্ত আসতে চাইলেও শীত যেতে চায় না
তাই আরও কিছুদিন রুক্ষতা .. ..
ঘামতে ঘামতে রুটি গড়ে দেওয়ার বদলে
তুলে দিলে বড় দোকানের, থালা থেকে আনা বড় কেক,
অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে আঁতোনায়েও দুর্বোধ্য রইলেন না।

কর্তব্য-ভরা বিকেলের বাড়তি বিষন্নতা
জেগে থাকে খোঁচা লাগা জামায়, আঁচল
টানলেও যা, ফেলে রাখলেও তাই,
একই অঙ্গে ভিন্ন রূপ। নিভৃত সান্নিধ্যে
আবরণ তাই খসে পড়ে।
আনুষ্ঠানিক লজ্জায় জড়তা আহ্বান করো না
সরিয়ে দিও না আমার দৃষ্টিপথ থেকে
ছিন্ন, অসতর্ক নগ্নতা।
এ আমার নেশার পূর্ণতা।

আমার প্রধান শত্রু ঘড়ি।
তবু মণিবন্ধে বেঁধে দিই মানানসই করে
ওর কাছে হেরে যাই আমরা দুজনেই,
চোখের আড়ালে গেলে ওর শত্রুতা গুপ্ত পথ নেবে।
আমরা কেউ অন্যের গুপ্তচর চাই না।
কিন্তু বরণ করি প্রকাশ্য রাজদূতকে।
দুই-ই পর অনুচর
একের কপালে খাতির, আর অন্যের ভাগ্যে চড়।
আমার কর্তব্য তোমাকে কাঁদায়,
দণ্ডিত, তুমি কাঁদ প্রকাশ্যে,
সমান আঘাতে দণ্ডদাতা, আমি কাঁদি মনের গভীরে।
কাঁদি আমি তোমার ও আঘাতে।
যাচাই করে নেওয়ার পালা শ্রান্তিহীন, ক্লান্তিহীন—
নাকি, এও এক ইচ্ছাধীন হিসেব ?
চিরন্তন শুধু ভুলে না যাবার সনির্বন্ধ আকুতি।

গর্জন দেখে বর্ষণ চিনি। তাকে ডরি না,
ভয় পাই শুধু বিলম্বিত বর্ষণ আর দীর্ঘায়িত গর্জনকে।

খরায় ধর্ষিতা বসুন্ধরা মুক্ত ধারাস্নান
দুঃস্বপ্নকে ফেলে রাখে অনেক, অনেক পিছনে।

আবার প্রেরণা আগে বাঁচার
আর এক প্রজন্ম গড়ে তোলার স্বপ্নে,
তখনই নতুন করে ঠিক হয় পরবর্তী পরিকল্পনা
অন্তত দেখা হওয়ার সময়টুকু।
গোপালপুর, পুরী, বেনারস তোমার স্বপ্নের শিশু
আর আমার কোলে-পিঠে লালন করা।
বাস্তবে তোমার আশংকা, তাই কল্পনাকে নাড়া-ঘাঁটা;
রূপকার আমি,
পূজা এল, প্রতিমার চোখের শেষ টানটা আমাকেই দিতে হবে

হে দর্শক, তোমরাই বলো ভবিষ্যত পৃথিবীকে
আমার প্রতিমার রূপে কোন খুঁত ছিল কি না?

প্রতীক্ষা

বন্ধ দরজায় আঘাত করতে গিয়ে
থমকে যায় শ্রুতি
সাংখ্য আর ব্যাকরণের কাঠিন্যে
শুধু কিছু শব্দজাল
বিন্যাসের অভিনবত্ব, আর
অশোকের রাজত্বে চলাচল।
পিচ-গলা আধুনিকতার দু'ধারে
পুরোনো কথা স্থাণু হয়ে থাকে
কিছু বাঁকা হরফে। পাথরের উপরে দাগ হয়ে।
তবু ওরা কথা কয়—
একান্ত গোপনে
প্রেমিকার মতই কানে কানে
সংগোপনে আর আশ্লেষে,
ওরা তার. ওরা সবার
কোণারকের দেওয়ালের নটী যক্ষিণী
আজও অপেক্ষা করে ডালি নিয়ে
যে তাকে চায় তারই জন্যে।
হয়তো কয়েক যুগ
বা কয়েকশো বছর আগে
আমারই নিভৃত আলাপচারিণী ছিল সে
সময়ের বিবর্ত্তনে পাথরে বাঁধা হয়ে,
আজ শুধুই উর্ব্বশী।

সকলের জন্যে নয়, প্রতীক্ষা শুধু গ্রাহকের জন্যে।

কামনা

অপূর্ণ তুমি একরাশ পূর্ণতার মাঝে
অথবা, পূর্ণ তুমি অসীম একটা অপূর্ণতা নিয়ে।
সমুদ্রের সফেন পূর্ণতায় ভাঁটার টান
আর চাঁদ ভাসি সমুদ্রে জোয়ারের উচ্ছাস।
তবুও প্রতীক্ষা ; প্রতীক্ষা
পূর্ণ একপাত্র গঙ্গাজলের।
গঙ্গোত্রী থেকে হরিদ্বার
আর সেখান থেকে সমুদ্র
মাঝে পাহারা শুধু মুঙ্গেরের।
কপোতাক্ষ জলের বুকে পলির ছাপ
নীলকণ্ঠ সমুদ্র সবই হজম করে আপন নীলের মহিমায়।
মহাদেবের জটার মাঝে ফিরে আসা
পরিবর্ত্তনের মাঝে অপরিবর্তনীয় হয়ে।

মেট্রোর সামনে এখনও একরাশ ভিড়
কালোবাজারির টিকিটে
কিংবা পায়া-ভারি আমন্ত্রণ পত্রে
নির্ভেজাল কাটা-ছেঁড়া বাদে কয়েকটি পূর্ণ শরীরের
প্রত্যাশায়।
তবুও শুধু বিছানাই
আদর্শ মিলনের আদর্শ স্থান নয়।

কবে কোন যুগে
মহাকালের অনেকগুলো লোম উল্টোদিকে অতিক্রম করে

দেবযানীর অভিশাপ বিঁধেছিল কচকে
শেখা ছিলো, শেখানো ছিলো
ব্যর্থ হয়েছিল শুধু প্রয়োগের প্রচেষ্টা।
অভিশপ্ত কচ অভিশপ্ত দেবযানী।
পিতৃনামদর্প শুধু কেঁদে কেঁদে ফেরে
জরায়ুর সুগভীর অন্তরে
দিন হতে দিনে, মাস হতে মাসে
যোগ-বিয়োগ করা ক'টি মাত্র দিনের ব্যবধানে।
ব্যর্থতার কালক্ষেপ—
তবু বাঁচে আশা, স্বপ্ন, ভালবাসা
শুক্রের পিতৃত্বে কচের পৌরুষে
আর দেবযানীর একমুঠো লালিত মাতৃত্বে।
একটা দিনে অন্তত একটা ঋতুস্নানে
পুরুষের কামনা যোগ হোক নারীর বাসনার সাথে।

অরণ্য

অরণ্য, বারবার আমাকে ফেলে দিয়েছে
তোমার কোল থেকে। কটা জন্ম? কটা জন্মান্তর?
গুণে রাখিনি, কিন্তু ভুলিনি
তোমার প্রত্যাখ্যান। শাল, শিমূল, জারুল, সেগুন
আব গরাণের—
চওড়া কুম্ভকর্ণের বুক থেকে—
পিছলে পড়ে গেছি, বারবার, কতবার।

অরণ্য, আমার অভিমানে তুমি কান দাও নি
পিছনে ফিরে বার বার দেখেছি শুধু
তোমাকে; বিশাল হিমালয়ের সমান হওয়ার জন্যে তোমার উচ্চাশা
আমাকে তুমি প্রত্যাখ্যান করেছ।

এবারও আমি ঘাসফুল, ছোট্ট মল্লিকা
কিংবা বুনোপলাশের চোখ জ্বালানো রং
সাঁওতালী মেয়ের আভরণ আমি—
আমি বর্ণ গন্ধ রূপ
এবং, এবং এক কঠিন বর্ণনা।

অরণ্য প্রতিজ্ঞ আমি তোমার সহচর হব
অন্তত একটা জন্মে

আমার ছায়ায় বসাব সেই কালো যুবতীকে
যে আমাকে একদিন নিত কুড়িয়ে
অথবা গাছ থেকে ছিঁড়ে, স্থান দিত নিজের রূপের মাঝে।

এবার আমি তাকে ঠিকই আশ্রয় দেব,
সুবর্ণরেখার গন্ধের মাঝে,
আমার এতদিনের প্রিয়—
আশ্রয়দাত্রী, প্রেরণা ও সম্ভাবনাকে।

মৃত্তিকা

জোব চার্ণকের সমাধির বুক ঘেঁষা
ঘাস বর্ষায় ঋতুস্নাতা ধরিত্রীর
কোমল বৃন্তচ্যুত হয়ে প্রেমিকার পেলবতা
আমাকে চায়। তিনশ বছরের বৃদ্ধের
জরাজীর্ণ ফসফেট
মৃত্তিকার রক্ত চোষে, রক্তবীজ, এখানে, সেখানে।

পরাজিত বার্ধক্যের নতুন সজীবতা
পেষণে, শোষণে স্বাধীনতা চায়—
মুক্তি, অখণ্ড মুক্তি, প্রেরিতা, আমার সর্বস্ব;
তোমাকে ছুঁয়ে আছে আমার পৌরুষ
মৃত্তিকা, ফলবতী হও, বৃক্ষচ্যুত হওয়ার আগের মুহূর্তে।

আকাশ, একটু কম নীল হলেও
তোমার ইন্দ্রত্ব বজায় থাকত, শুধু
অপ্সরাই মুগ্ধ তোমার নীলে। আমি কবি—
চাই বৈচিত্র্য, কিছুর বিনিময়ে
চাই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ধরে ঘূর্ণিত তোমাকে,
এক অপলক নিষ্ঠুরতায়।

মেরুদণ্ডবিহীন সাফল্য আর ব্যর্থতা ঢেকে রাখে
আমাকে, তোমাকে,
আমার মৃত্তিকা, আমার প্রেমিকা,
হে প্রেরিতা—ঈশ্বর তোমার না আমার?

তৃষিতা

কিছু জ্যামিতিক রেখা,
আর অল্পস্বল্প ছাঁচে আঁকা নক্‌শা
দুই চোখের প্রান্তদেশ বরাবর ঢেউ খেলানো প্রতিচ্ছবি
আমাকে ব্যাকুল করে, হে তৃষিতা, আমাকে চঞ্চল করে।

জীবন বদল করে একপাল যুবক
ঠোঁটে জ্বলন্ত আগুন, কারুর বা কানের ভাঁজে ধূসর
দিশি তামাকের গায়ে শিবঠাকুরের লাল তাগা
ছুটে চলে রাতদিন, দিনরাত, অচঞ্চল ও অবিরাম।

তৃষিতা, তোমার উদ্দেশ্যে আঁজলা ভরে
ফেলেছিলাম কিছু পুণ্যতোয়া দূষিত জলে
মণিকর্ণিকায়, এক সকালে।
দুপুরের ঘোলা জল বিকেলের স্নিগ্ধতায়
মশগুল হল। উপরের চাতালে ধোঁয়ায় ভরা—
গাঁজা আর হেরোইন। ওরা চলে গেল
আমার অঞ্জলিতে পরিত্যক্ত দেহজ নির্যাস ফেলে।

ওরা যুবক, ওরা একদল, ওরা ভবিষ্যত
গরম বালির নীচ থেকে উঠে এক ঝাঁক বেদুইন লাভা।

পূজা

ব্যর্থ আমি, ব্যর্থ তোমার প্রশ্নের উত্তর
তোমার হৃদয়ে সদর্থ হয়ে সঁপে দিতে।
হয়তো, শুধুই হয়তো।
সব প্রশ্নের আক্ষরিক উত্তরের পরও
অভাব কেন তবে মানসিক পরিমিতির ?
গাড়ী প্রস্তুত, প্রস্তুত যাত্রী, চালক
এবং আর সব কুশীলবরাও।
তবুও অভাব শুধু গাছের পাতা রংয়ের সংকেতের।
ওকে ছাড়া যাত্রা হয় না,
অনাগত দিনের অনাগত সৌন্দর্য্য
ভবিষ্যতের আশা হয়ে জেগে থাকে
যাত্রা থেকে শেষ যাত্রার স্থান পর্যন্ত
পায়ে পায়ে অনুভূতি ভাগ করতে দাও।
আকাঙ্খা শুধু সাথী হওয়ার
অন্যের ঈর্ষা, হিংসা কিংবা দ্বেষ
উপেক্ষা করেও।

কাল থেকে মহাকালে অবতীর্ণ
গঙ্গা, তার দূষিত জলে বহন করেও
পূতগর্ভা, তাকে মাথায় ছিটিয়েই
যত কিছু কল্যাণ-কামনা।
সেই মুহূর্ত বড় আদরের—

বড় কঠিন সিদ্ধান্তের।
ভোরের সূর্য্যটি আলো ঝরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত
বিদায়ের সংকেত নেই—অনিচ্ছার সবুজ আলো।

হয়ো না বাদী,
বড় কঠিন প্রতিবাদী হয়ে লড়াই করব—
না-দেখা ঈশ্বরের বিচার সভায়।

মধ্যরাতের সন্ধিতে সান্ত্বনা

কলম এখন ক্লান্ত
মূর্ত বেদনা শুধুই পথের দূরত্ব মাপে।
আমার স্মৃতি বেদনার সেতুর উপর চলমান।
তবু তা কাম্য। অন্ততঃ আমার কাছে।
অপ্রকাশ্য থাক সে। সংগোপনতার লতায় জড়ানো
আমার গভীর নিজস্ব সম্পদ।
ইচ্ছেমত নেড়ে চেড়ে দেখার স্বাধীনতা খোয়াতে চাই না,
কারুর সঙ্গে ভাগ করে নেব না তাকে।
না-বলা কথার মাধুর্য্য পরশ দেবে তৃপ্তির।
সেতুর ব্যবধান কুয়াশায় ঢাকা নয়,
বিচ্ছেদ গরম হাওয়ায় আর গাঢ় ক্লোরোফিলে।
সমতা দুপারের নোনা জলে।
না-ফেলা চোখের জল বাষ্প হয়ে উড়ে যাক
তৈরী করুক তার হারের একটা মটর দানা।
সবার থেকে আলাদা—
কল্পনার ঔরসে আর সাধের গর্ভে জাত শিশুটিকে।
তবু আসে হিংসে।
হিংসে সেই উড়ন্ত বাজপাখীকে
যে আকাশের বুকে উড়িয়ে নিয়ে যায় তাকে
বিমান-সেবিকার আদর আর যত্ন দিয়ে।
হিংসে আমার তাকে
যে চোখের জল না ফেলেও দাবিতে সোচ্চার হতে পারে।

মধ্যরাতের সন্ধিতে সান্ত্বনা,
অথবা কল্পনায় জয়ের আনন্দে।
পরের সকালের সূর্য ওঠা
আর দিনের শেষে সোনাঝুরির ঝরে পড়া
এনে দেয় নতুন উন্মত্ততা।
বেলাভূমিতে ভেঙে পড়া ঢেউ গুণে শেষ হয় না-
প্রতীক্ষা জন্ম দেয় পরবর্তী প্রতীক্ষার।

ঝুলন্ত সেতুর ওপর নিস্তব্ধতা

সে এক সুদূর দিনে
দেখেছিলাম সেই স্বপ্ন
যা এখনও দেখি মাঝে মাঝে
ঘুমের গভীরে, অথবা রাতের নৈঃশব্দ্যে।

স্বপ্ন আসে
নিবিড় মায়া মাখা এক চোখে।
একদিন—
ইঁট রঙা আকাশের রঙ বদলের সময়
সে ধরা দিল আমার বাস্তবে—
চোখ আর রূপ নিয়ে।

পৃথিবীর কোন এক পার থেকে আসা
ঝড়ের দাপটে
উড়িয়ে নিয়ে গেল আমার প্রতিজ্ঞা
আর দৃঢ়তা ;
হারালাম রূপের ঔজ্জ্বল্যে,
স্নিগ্ধতায়, আর চোখের তারার ঠিক মাঝখানটিতে।

ঝুলন্ত সেতুর ওপর
নিস্তব্ধতা যখন জেগে পাহারা দেয়
কঠিন বাস্তবকে
সে আসে ঘুম কেড়ে নিতে,
পৌরুষের তেজে, কঠিন আবেগে, আর

ছিঁড়ে খুঁড়ে নেওয়া অকৃত্রিম পোশাকে।
তবু ভাষাহীন হয়ে থাকি,
নীরব মুগ্ধতায় আর অগাধ শ্রদ্ধায় ;
'চাইনা' বলার মত সাহস
আজ সমর্পিত,
সে রূপে, আর সেই চোখে।

একাত্মা

পদাতিক আমি, ভাল হত এক অশ্বারোহী হলে
অথবা হাতির পিঠে চড়ানো হাওদায় চেপে
এক বাবর, আকবর, ঔরংজেব
কিংবা নিদেন পক্ষে এক ব্যর্থ হুমায়ুন।
লাল রক্তের বিনিময়ে শাদা তাজমহল গড়ে তোলার
ক্ষমতা যদি আমার থাকত ?
যদি বা হতাম এক দ্রোণাচার্য
একলব্যের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নিয়ে পলিতকেশ এক বৃদ্ধ অস্ত্রগুরু
শুধু পক্ষপাত নিয়ে বেঁচে থাকা !

হল না, হল না কিছুই
বেঁচে রইলাম শুধু অরণ্যে কস্তুরী মৃগ খুঁজে
চুরি করে পালানো বিকেল দেখে
হেমন্তের ঝরা রোদে বিষন্ন স্নেহ খুঁজে
শিউরে ওঠা নির্জনতায় টন্‌টন্‌ করা বুক নিয়ে
আর ? আর ?

আরও আছে, বুকের মাঝে স্বপ্ন, আশা
আর ভালবাসা,
একেই কি তোমার হৃদয় বল ?
এরই রং কি টকটকে লাল ?
প্রাচ্যের শ্যাম, প্রতীচ্যের সরস্বতীর ফ্যাকাশে রং
কিংবা আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গিনীর
ধমনীতে একই রংয়ের রক্তের মত ?
নিস্তব্ধতা, হে নৈঃশব্দ্য
অন্তত মুহূর্তের জন্যেও স্বপ্নের মাঝে
আমি তোমাদের সাথে এক, একাত্মা।

মিলন

বসে আছ পদ্মাসনে, তুমি
জ্বলজ্বলে লাল পাহাড়ের সীমারেখা
নিজেকে বেঁধে ঃ সাদা জমিনের ওপর
কলের কাজ—হাতে চালানো তাঁতের বুক চিরে
যন্ত্রণা ফুটে বেরোয়—
কলের সরব আর্তনাদ হয়ে। লাল, চারদিকে লাল
আর কিছু দেখিনা আমি, আমি যেন
ইন্দ্রের বর হয়ে নেমে আসা এক অর্জুন
লক্ষ্যভেদে পার্থ ;
শুধুই চোখের মণি খুঁজি আমি—
কখনও গাছের মাথায় বসানো পাখির
অথবা, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে ঘূর্ণমান মাছের।
আমি ইন্দ্র, আমি অর্জুন, আমি পার্থ—
মূর্তিময় কিন্নর হয়ে তোমার চলার পথে।
অথবা আর একদিন—
আকাশ যখন তুঁতে রংয়ের মোহ ছেড়ে
রাধার প্রেমিক হয়ে উঠতে চায়
আন্দোলন তোলে ছড়ানো পেখমে
তখন সেই একই তুমি, মিষ্টি মেয়েটি হয়ে
হাঁটুতে মুখ গুঁজে ছড়িয়ে দাও, তোমার দৃষ্টি
উদাসীন, এক বিষণ্ণ আসক্তিতে।

হেমন্তের একচিল্‌তে আদুরে স্পর্শ নিয়ে
হাত দিই তোমার পিঠে
আদর চুম্বন. স্পর্শ আর রক্তিমাভ সঙ্গম
মিলেমিশে একাকার—

তোমার মনে পড়ে না তখন, দুঃখ যে ছিল কোনদিন
তৃপ্তি, আশ্লেষ, দুচোখ ভরে ঘুম
যেন মহাকালের সৃষ্টির মুহূর্তে সেই প্রথম মিলন
হে আদি, হে অনন্ত, সত্য তুমি, সত্য আমি
সত্য এই পৃথিবী।

আনন্দ

তোমার উদ্বেলিত শ্রোণীযুগে আমার আহ্বান
বসন্তের ব্যথা হয়ে অগ্নিগর্ভ ডাক
বারুদের গন্ধের সাথে কস্তুরীর ছোঁয়া
যেন তুষারযুগের হিম গলে গলে
স্রোত হয়ে নামে, কতযুগ পরে অসীম ব্যথায়
আনন্দের হিমবাহ, স্বর্ণচূর—
মহানদীর বুক ছেঁচে উৎসমুখে সন্ধান।

উপত্যকার ভাঁজে পাতা একটি শিয়র
ত্রুটিহীন তব দৃষ্টি, নিদ্রাহীন, পক্ষকাল।
ঈষৎ খয়েরী বৃন্তে বিস্ফারিত সূর্যমুখী
হলুদ নয়, হরিদ্রাভ, শিয়রেতে নিদ্রাহীন, পক্ষকাল।

সর্পিল কোমর বেয়ে সরীসৃপের ত্বক,
রোমাঞ্চ গভীর, এবং পদ্মপাতায় শিশিরের ছোঁয়া।
জল কেন? স্বেদ না অশ্রু, তাপ না পরিতাপ?
কিংবা এক ঝলক আশার সূর্য?

সম্রাজ্ঞী, মধ্যপ্রাচ্যের ক্লিওপেট্রা
তৃপ্ত কি তুমি সিজারের আস্বাদে,
অথবা উচ্চাশার প্রয়োজনে? গাও, গান গাও,
পৃথিবীর ধূলিকণা বেঁচে থাক, তব সাম্রাজ্য হয়ে।

নিদ্রা, চিরনিদ্রা

এক কাপ কফির ধোঁয়া. কিংবা
কিছুটা ঠাণ্ডা মেশানো বাদামী গুঁড়োর সরবত—
এক চুমুকে পান করতে চাও ? কঠিন তোমার ইচ্ছে
দুরারোগ্য এক প্রতিফলন, মানসিক ব্যাধি উৎসের।

পোড়া তামাকের গন্ধ তোমার বইয়ের পাতায়
বনেদীয়ানার বৃদ্ধ ঘুণপোকা
প্রহর জাগে, তোমার অজ্ঞাতে,
শরাহত তার শব্দ দূরাগত সপ্তাশ্বের প্রতীক্ষায়
নামিবিয়ার রাজনীতিতে, কিংবা কাম্‌পালার জঙ্গলে।

কোন এক মাতৃসমা রমণীর ক্রন্দন
হা-ভাতের বুকে। নীল দেওয়াল, নীল পর্দার
হৃদয় ছিঁড়ে রাত বাতির নীল, তোমার
নীল স্বচ্ছবাসে, রাতের আহ্বানে।

কাশ্যপ, চার্বাক কিংবা ব্যাসদেবের শ্লোক
এখন দুর্বোধ্য। আমার পানীয় কই ?
কই সে তোমার সুগন্ধি শরীরের কবোষ্ণ ও তাপ।
নির্জন সৈকতে আমার নিদ্রা,
স্তব্ধ, মৌন, আমার চিরনিদ্রা
আশ্লেষে, সম্ভোগে।

প্রেয়সী

দীর্ঘায়ত সৌন্দর্য তোমার শরীরের আশপাশ ঘিরে রাখে
বুনো লবঙ্গলতার মত ; বর্ষার শেষের ঘাসফুলের
নরম কমনীয়তা সর্বাঙ্গে, স্পর্শে শিহরণ,
অষ্টাদশ শতকের রোমাঞ্চ। এবং মাদকতা,
হে প্রেয়সী, এই তুমি, অন্তত এই অসাড় বর্তমানে।
আমার ও তোমার যুক্ত আকাঙ্খার এক সফল মানবীয় রূপ ॥

এক ছোট্ট বিজ্ঞাপন বুঝি বা
প্রসাধনের, সুগন্ধির, স্যানিটারী ন্যাপকিনের,
অথবা চুলের তেলের, কিংবা একটা অযথা মুখের প্রচার
ব্লেডের হোর্ডিংয়ে বা বিস্রস্ত বসনা সাবানের ফেনায়।
এখন প্রয়োজন নেই নগ্নবেশে টয়লেটমুখী হওয়ার।
এখনও বেশ কিছুটা সময় আমাকে ডুবে থাকতে দাও
ও কস্তুরী ঘ্রাণে, বিলম্বিত লয়ে, বিকেলের শেষ সূর্যে।

তামরাও কম্পিত দেহরেখায় আমি দেখি এক দুধ-সাদা সমাধি
জীবন রহস্যের বাঁক হয়ে ফিরে বেড়ানো
এক গভীর নদী ; বিস্ময় বাঁকে বাঁকে,
বাঁক থেকে বাঁকে, তান থেকে লয়ে,
আমারও প্রতিজ্ঞা ছিল অমর হবার
আমারও সিদ্ধান্ত ছিল ছিনিয়ে নেবার
অর্জুনের সারথি হয়ে যুদ্ধের কাণ্ডারী হবার।

অথচ, হল না কিছুই। যদিও বা
নিয়মের ব্যতিক্রম আমার দৃষ্টিকে করল দীপ্ত

গোয়ার সোনালী সমুদ্রতীরে,
কিংবা দমনের কালো বালির ওপরে
দুর্লভ কাজুফেনী আমাকে নিয়ে চলে সূর্যের দোসর হতে।
স্বপ্নের রূপোলী পরী আমাকে প্রবেশ করতে দেয়
তোমার মানবীয় রূপের পরতে পরতে।

অন্তত আর আমি হিংসে করিনা সূর্যকে
আমি ওরই সহযোগী এক সাথী,
তোমার শরীরে প্রবেশের ক্ষণে,
প্রসঙ্গ বদল হয়, প্রেক্ষাপট বদলে যায়,
আমার বুকে মাদল-বাজানো পাগল পোকা হাততালি দেয়।
আমি মানুষ। আমি ভোগকরি আমি তৃপ্ত হই।

কেমন সূর্যরশ্মি,
বলেছিলাম না, কোন এক জীবনে তোমাকে আমি হারাবই

আমি একা

অন্তত সেই মুহূর্তে সেই বেবাক বিশ্বসংসারে আমি একা।
একে তো আমি একাই বলব। অ্যাশট্রেতে সিগারেটের পোড়া টুকরো
বিছানার উপর তোমার দলা-পাকানো শাড়ি, যার
পাটভাঙা ইস্ত্রি নিজের হাতে না ভাঙলে আমার তৃপ্তি
হয়তো বা একটু কম হত।
ইঞ্চি-ভাঁজ ফিনফিনে ব্লাউজ, আর—
তাপদগ্ধ শরীর থেকে তলতা চামড়া ছাড়ানোর মত
সোহাগ মিশিয়ে হুকখোলা বাহারী ব্রা।
না, ওরা আমার সঙ্গী নয়। ওদের কোন অনুভূতি নেই।
অথচ এই শাড়ী এই ব্লাউজ আর—
    এসব তো আমার নিজের হাতেই কেনা।

দোকানের সাজানো শোকেসে ওরা সুন্দর ছিল
আর, এখন, আমি স্থির নিশ্চিত,
ওরা সুন্দর কিংবা অসুন্দর কিছুই নয়।
ওদের মুখে সুললিত ভাষা ফোটে তোমার সৌন্দর্যেরপ্রেক্ষাপটে,
ওরা সুন্দর যখন মনের গভীর থেকে তুমি
বুদ্বুদ হয়ে ফুটে ওঠ, ফেটে পড়। ওরা উপগ্রহ।
ওদের আলোক তোমার ফিন্‌কি-ছেঁড়া সৌন্দর্যের
    বিচ্ছুরণে, আমার পৌরুষের বহিরাবরণে।

মোনালিসা-র হাসি দেয়ালের পেরেকে
যার পাশে যীশুর চিরন্তন বিদ্ধ যন্ত্রণার ছবি;
মোনালিসা, তুমি কাকে দেখে হাসছ? যীশুকে না আমাকে?

আমাকে না যীশুকে ?
অথবা রক্তে ঢেউ তোলা পরিত্যক্ত ও বসনগুলিকে,
যারা ধোয়ার অপেক্ষায়, আবার ব্যবহারের জন্যে ?
নাকি, তুমি সবসময়ই হাস, একই ভাবে
এক অপরিবর্তনীয় অভিব্যক্তিতে ?
যুগ তোমার ঐ হাসিকে ধ্রুবতারা করে রাখতে বাধ্য হল—
এতবড় তোমার ঔদ্ধত্য ? আমি তোমার হাসির ঝিলিক
ডান ঠোঁট থেকে সরিয়ে
বাঁদিকে দেব, অথবা মাঝখানে।
আমার সহ্য হয় না তোমার ঐ স্থির হাসি ; চঞ্চল, অপলক।

শুধু কথা দাও,
পরিবর্তনের পরেও মোনালিসা নামে ডাকলে
তুমি সাড়া দেবে তো ?

ভিখিরি

একটা মাত্রই উচ্চাশা ছিল ছেলেটির
আদর্শ একটা ভিখিরি হওয়ার।
লোকে ডাক্তার হতে চায়, হতে চায় ইঞ্জিনীয়ার,
কখনও সখনও বা অফিসার, লেখক কিংবা শিল্পী,
সে কিন্তু হতে চেয়েছিল শুধুই একটা ভিখিরি
বড়, বেশ বড় এবং পুরোপুরি আদর্শ।
তার নিজের ছিল একটা নীতি
ছিল একটা নিটোল পরিকল্পনা।
পড়া ছিল, লেখা ছিল, ছিল সংবেদনশীলতা
আর একটা গভীর দৃঢ়তা—
ভিক্ষা ছাড়া কিছুই যেন অবলম্বন না হয়।

সে চেয়ে নিত বই, কলম, খাবার-দাবার সব
জোর করে গুঁজেদেওয়া স্তন্যদুগ্ধই ছিল ব্যতিক্রম,
এবং চেয়ে নিতে পারার আগের অধ্যায়টুকু।
সার্থক হল তার বৃত্তি, পরিপূর্ণ নেশা।
সে আকাশ দেখতে চাইল না, দেখতে চাইল না রংয়ের আস্তরণ,
একবার কিন্তু সে পাখির নরম পালকের
স্নিগ্ধতা অনুভব করেছিল,
তাও ভরা, দু-আঁজলা ভরা চাওয়া দিয়ে।
ছিল না তার লোকায়ত যন্ত্রণা—কোন প্রত্যূষে,
কিংবা কোন সন্ধ্যায়, ভরা দুপুরে বা মাঝরাতে।

ভিক্ষাকে শিল্পের স্তরে উন্নীত করে
ভিক্ষা দেওয়ার পর্যায়ে উত্তরণ হল তার।
অতিথির তো অতিথি হয় না,—
নরম ছোঁওয়া পাবার ক্ষণটিতে
কঠিন যৌবনে,
ভিক্ষা দিতে ব্যর্থ হল সে
চাওয়ার কবুতর বুক তাই ক্ষণস্থায়ী
অটল, অচঞ্চল, চির ভিখিরি
ওই সে কুমার।

কণ্ঠহার

অনন্ত সমুদ্র মাঝে ফেনিল উচ্ছাস
পলে পলে ; ক্ষণে ক্ষণে ; অচকিত প্রকাশ্যে।
গীত চিরন্তন
মহাম্বুধি রহস্য চাহে বিকশিতে আপনারে
সবাকার মাঝে।

মাণিক ? মুকুতা ?
কালাহারির বিস্তৃতির পারে হীরকের সন্ধান
রিখ্‌টারস্‌ভেল্ডে ? অথবা নিউটনের উপলখণ্ড ?
এসব তুলনা তোলা থাক। মন্দাকিনীর
করুণ তীরের বেদনামাখা পরশমণি,
পরশে হয়েছে সোনা জানি না কখন।

ইতিহাস
জন্ম থেকে মৃত্যু। মাঝে কিছু সঞ্চয়
পৃথিবীর সুকৃষ্ণ জরায়ু ছিঁড়ে অমৃতের সন্ধান।
নভোমণ্ডলে সাঁতার কাটা। শূন্য পরপার।
স্বাতী অরুন্ধতী বিশাখা বিপাশা
কে তোমাদের ঠাঁই দিল পৃথিবীর মাতৃদুগ্ধ ছেড়ে
আর এক মায়ের কোলে ?

প্রাণ, তুমি কার ?
আপন পরিধি অতিক্রান্ত আজ। মহাবিশ্বে
সবাকার মাঝে দীপ্তিময়ী ঐশ্বর্য।

নাটকের আন্তর অঙ্ক।   গর্ভাঙ্ক
যুঁই, যূথি, জাতি ছড়িয়ে পড়ছে দর্শনার্থীর ভিড়ে
মহারাণীর স্খলিত কণ্ঠহার থেকে।

হে সরাইখানার পান্থ, কুড়োবে না একটা কি দুটো ?
না কি, তোমার সৃষ্টি হবে চলমান
সহযোগিতায় সহমর্মিতায়
এক গভীর সুঠাম প্রতিযোগিতায় ?

শ্রদ্ধা

(প্রয়াত হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্মরণে)

ত্বরান্বিত তোমার যাত্রাপথে, মাধ্যাকর্ষের সীমানা ছাড়িয়ে
আমার অঞ্জলিভরা পুষ্পভার তোমাকে অনুসরণ করুক ।
অনুসরণ, অনুসরণ, সহগামী আমার চেতনা
আমার বেদনা, আমার অন্তর্জলি ।

পৃথিবীতে, হাওয়া দোলানো পাটভাঙা সবুজ বুকের ওপর
তোমার ফেলে যাওয়া শ্বাস-প্রশ্বাস-নিশ্বাস
বন্ধ করা আমার কানের পর্দায় রাবণের চিতা জ্বেলে রাখে ।
এবারও ফসল হওয়া-না-হওয়ার দোলায় দুলবে চাষী
মাটির সোঁদা গন্ধে গাঁয়ের বধূর উদোল বুকে
দুধের পাতলা সরের মতো শিরশিরানি উঠবে
এবারও বান-ভাসি জলের গন্ধে নৌকোর উপরে জীবাণু যন্ত্রণা
আশ্রয় খুঁজবে । শত যন্ত্রণার দুঃখ বুকে চেপে চলতে থাকবে
প্রেমিক-প্রেমিকা, এক কল্পসুখের আস্বাদনে ।
এবারও বাঙালীর সার্বজনীন দেবীরা আসতে থাকবেন আগের মতই
রঙীন স্মৃতি, রঙ-জ্বলা বিস্মৃতি
আদিগন্ত সুর হয়ে বাজবে ক্যাসেটে, প্যাণ্ডেলে
মাইকে কিংবা দূরদর্শনের পর্দায় ।

রাজগৃহে এবং শ্মশানে তোমার শত সহস্র অনুগামী
তোমাকে অনুসরণ করে, তোমার অনুগমন করে
অনুসরণ, অনুসরণ, অনুগমন, অনুগমন
আমার বেদনা, আমার অন্তর্জলি ।

লাল গোলাপের উষ্ণতা স্তিমিত হয়ে
আজ সাদা পুষ্পভারের সুগভীর শান্তি।
বড় বেশি সাদা আমাকে বেদনাহত করে
তবু রোদ্দুরের পথশ্রমে ক্লান্ত আমার বিশ্রান্তি
দূরাগত তমসার বুকে ফুটে থাকা সাদার সমারোহে।

বায়ুভূক নিরালম্ব আত্মার সুগভীর আচ্ছাদন
এক গভীর মায়ায় টেনে নিয়ে চলে জনতার স্রোতকে।
এ কেমন মিছিল? কাউকে ডাকতে হয় না
সংগঠিত করতে হয় না
মুখে সাজিয়ে দিতে হয় না কতকগুলো একই কথার একঘেঁয়েমি
নিঃশব্দ ওদের হাতে পোস্টার নেই, ব্যানার নেই
কেউ চলছে না সাথে সাথে গুড়-রুটি তরকারি নিয়ে।

শ্মশানের মূল ফটকের সামনে একটি বালক
ত্রুটিহীন দৃষ্টি নিয়ে অপেক্ষা করছে, হাতে আর
মোটে চারটে রজনীগন্ধার কঞ্চি। বড় পবিত্র।
কাঠ আর খাটিয়ার ক্যানভাসে একটি দৃঢ় আশা
ও নিস্তব্ধতা। যাত্রাপথের শেষ দরজায়
প্রথম শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ চায় সে।
হে মহান মানুষের মহামিছিল
একটু সরে দাঁড়াও।
অন্তত একটা মুহূর্ত অপেক্ষমান পবিত্রতাকে দাও
তার করজোড় উন্মুক্ত করতে।

ওরই তো প্রার্থনা ছিল, কালিদাসের মত
সরস্বতীর একটা বর
প্রয়াত শিল্পীর কণ্ঠস্বরকে অন্তত আরও একটা প্রজন্ম ধরে রাখার,

বনদেবী

বনের মাঝে বনদেবী, ভক্তের আঘাতে
তুমি রক্তাক্ত, ভক্তের আদরে।
এত প্রণামের, এত আকুতির, এত নিবেদনের
ভারে বুঝি ভাবগম্ভীর
না কি জড়দ্গব ?
অহংকার করো না, ওরা ভালবাসে
বলেই তুমি দেবী। ওরা প্রার্থনা জানায়
তাই তুমি বরদাত্রী।
যদি এমন কোন দিন আসে, যেদিন কেউ
তোমায় ভালবাসলো না
ডাকলো না আকুল ভাবে,
দেবী, সেদিনও তুমি দেবী থাকবে তো ?
মর্ত্যের মানুষের ভালোবাসার গরবে গরবিনী
অহংকৃত হয়ো না।

প্রকৃতি তোমার, সৃষ্টি তোমার, স্বর্গ তোমার
অমৃত তোমার, সাফল্য তোমার, ব্যর্থতা তোমার।
মনের আনন্দে সুধা পানে অমরত্বের চাষ হোক।
সৃষ্ট পৃথিবীতে, সৃষ্ট প্রাণে
তোমার বিলাসিতার অভিলাষ ; সেখানে অমরত্ব নেই
অমৃতত্ব আছে। আছে সুখ দুঃখ ভয়
কামনা বাসনা
সাফল্যের অভিক্ষেপ, কামনার বিক্ষেপ।
এসব জাগতিক জিনিষ তোমাকে স্পর্শ করে না
তবুও, এরা না থাকলে তুমিই বা কোথায় ?

শান্তি

হাজারটা লাল গোলাপ ফুল দিয়েও
ঢাকা গেল না সমাধি স্তূপ। ঐ মাঝারি
মাপের দেহটা মাটির অতলে শান্তির দরজায়।
শুধু ফুল দিয়ে কি করে মাপবে সেই শান্তির দৈর্ঘ্য ?
শুনশান চারধার, কথা বলো না, যদি সম্ভব হয়।
অথবা ফিসফিস। না, থাক না তা-ও। বড় যন্ত্রণার
অবসান। নৈঃশব্দ্যই শান্তির যাত্রার পাথেয়।
ছোট্ট শিশুটি। দুহাতের ছোট্ট মুঠিতে গোলাপ কোড়ায়
আবার বসাতে যায়। অনভিজ্ঞ ব্যথা।
ফুল ঠিক বসে না। আক্ষেপ ; কিন্তু
পরের পরের সযত্ন প্রচেষ্টা। ক্লান্ত, বিন্দু বিন্দু ঘাম।

ও খোকা, হারিসনে, হেরে যাসনে। এই তো
সবে শুরু তোর সংগ্রামের। ফুল যেখানে থাকছে না
সেখানটা ভরে দে না
তোর নরম পবিত্র হাতের ছোঁয়া দিয়ে
কিংবা, অশ্রু, অশ্রু ? পারবি না অতটা কাঁদতে ?
অথবা কান্না নয়, পরশের প্রলেপ
ফুলের থেকেও বড় শান্তিময় তোর সে সকরুণ
অনুভূতি। জল, জল নয়। মাটি বালি মরুভূমি
মরুদ্যান কোথায় ? আরবী রুক্ষতার মাঝে
শুকনো খেজুর, চামড়ার ব্যাগ থেকে ঢেলে নেওয়া পানীয় ?

যীশুর কষ্ট তুই জানিস?   জানিস গাছে ঝোলা
মৃতদেহের যন্ত্রণা মৃত্যুপূর্বে?   অথবা আগুনে পোড়ার
কিংবা দুর্ঘটনায় আত্মদানের যন্ত্রণা?
জানিস না, থাক, না জানাই ভালো।

আমরা পৃথিবীর মানুষ, স্বর্গ এবং নরক থেকে
ঠিক ঠিক সমান দূরত্বে॥

প্রশ্ন

ছোটবেলায় শিশিরে পা ভেজাতাম। কত ছোট্ট
জল, জলবিন্দু; আতুর পায়ে মাটির সোঁদা গন্ধে
ওরা সব ছিল আমার একান্ত নিজস্ব পাওয়া।
এখন আর যাওয়াই হয় না গাঁয়ে, শিশির মাখতে।

এক বুড়ো বিজ্ঞানী ছিলেন। হঠাৎ কিসের খেয়ালে
পাগল হলেন। উদোল গায়ে হাফপ্যান্ট পরে ভোর ভোর
নেমে পড়লেন মাঠে। শিশির ভেতর শিশির জমিয়ে রাখবেন
আজন্ম আমৃত্যু। আমরা দেখলাম নলের মতো ছোট ছোট
কাঁচের বুকে মুক্তোবিন্দু।
    শিশির, মুক্তো ; মুক্তো, শিশির
        কাঁচের বুকে, আমার বুক থেকে।

মানুষটা হঠাৎ একদিন ক্ষেপে গিয়ে শুরু করলেন তাণ্ডব।
বিন্দু ছোট হয়েছে। বাষ্পীভবন।
কিন্তু গন্ধ কই? সেই বুকে ঢেউ তোলা মিঠে মিঠে
মাটির গন্ধ। শিউলি মাখানো? কে চুরি করেছে?
আমি নই, তুমি নও, সে নয়।
রাম নয়, শ্যাম নয়, যদু নয়।
টম নয়, ডিক নয়, হ্যারি নয়।
কে? কে তবে?
বিজ্ঞানী, তুমি অসীম জ্ঞানী। প্রশ্ন তোমাকেই।

আমি যদি....

সেই স্কুলের পাঠ থেকেই রচনা লিখতে হত,
আমি যদি প্রধানমন্ত্রী হতাম
কিংবা আমি যদি পাখি হতাম
অথবা আমি যদি এক বুড়ো বটগাছ হতাম

লিখেছি, পাতার পর পাতা
অমুক হলে তমুক করতাম
এই হলে সেই করতাম
ওসব হলে সেসব করতাম।

শুধু হলে, হলে আর হলে...
আসলে আমি স্কুলের খাতায় রচনা লিখতামই না
আমি যদি প্রধানমন্ত্রী হতাম
কিংবা আমি যদি পাখি হতাম
অথবা আমি যদি এক বুড়ো বটগাছ হতাম

তবুও লিখেছি, কেননা ওসব হয়ে কেউ কোন পরীক্ষা দেয় না
আমি ওসব নই। তাই না শুধু যদি যদি আর যদি....

এখন আমার পরীক্ষা অন্য। তাই অন্য রচনা
অন্য ভাবনা অন্য সংঘবদ্ধতা অন্য বিচ্ছিন্নতা।
এখন আমি বিচ্ছিন্ন হব ভেবে সংঘবদ্ধ হই
সংঘবদ্ধ হব ভেবে বিচ্ছিন্ন হই
ঘুমোবো ভেবে শুধু শুয়ে থাকি
কাজ করব ভেবে শুধু হাত-পা নাড়ি
কিছুই করব না বলে কাজের কথা ভাবি।

পড়ব ভেবে বই কিনি
লিখব ভেবে কলম আনি
আঁকব ভেবে পেন্সিল তুলি
মুছব ভেবে ইরেজার খুঁজি
ভাঙব ভেবে শিশি মুছি
দেখব ভেবে টিভি খুলি
পরিশ্রম করব ভেবে বিশ্রাম করি

বিরক্ত করো না, আমার এখন অবসাদ
চুপ করে বসে থাক, দেখ-ই না ক'টা হাই তুলতে পারি ॥

কলকাতা ঃ তিনশ

বুড়ি কলকাতার বয়স এখন তিনশ
আমার সামনে দেখেছি তাই ঠিক ঠিক
তিনশো প্রশ্ন, তিনশো সমস্যা তিনশো
আনন্দ আর তিনশো জিজ্ঞাসা,

মানুষের সাথে কলকাতার তুলনা কেন
অথবা সেই অর্থে কোন দেশের, শহরের
গঞ্জের গাঁয়ের বা নদীর ?
তুলনাই যদি বা, লিঙ্গ নির্ধারণ কিভাবে ?
নদ-নদী নগর-নগরী বুড়ো-বুড়ি
এসবের তুলনামূলক সংজ্ঞা আমি বুঝি না—
বিশ্বাস করি না গোঁজামিলের তত্ত্বে ।

ঈ-কারান্ত আ-কারান্ত চিহ্ন যোগ করে
ওদের আমি মানবী করে দেব ? আমি
শংকিত লজ্জিত ঘৃণিত বোধ করি ।
নারীর চিহ্ন
স্তন কুঁচ পীন উন্নত বা অনুন্নত
ঢল-নামা কোমর, সচেষ্ট মুখ-তুলে তাকানো
নাভিমূল বা সুঠাম পয়োধর কই ওর ? কই বা
রোমশ রোমাঞ্চ—কচি ঘাসের কুঞ্চিত অধর ?
তবে ও নারী কেন ?

প্রশস্ত ফুলে আসা বুকের দুদিকে বক্র বাদামী ইঙ্গিত
আর স্ফীত বাইসেপস্ । পেশী, জমাট মাংস
ক্ষুর-বোলানো মুখে কয়েক ঘণ্টা পরের সবুজাভ আশা

তা-ও বা কই ?

তবে ও পুরুষই বা কেন ?

নারী নয়, পুরুষ নয়। তবে কি নপুংসক ?

ছিদ্র ফুঁড়ে বের হওয়া জৈব বর্জ্য স্রোত

হাতে এক ছন্দিত বিসদৃশ তালি, সেই

সেই সন্তানহীন বা হীনা-র অন্যের সন্তানকে

পূত করার ধর্মীয় সংস্কার।

মিল নেই কারুর সাথেই। জড়ের নিস্পন্দ

ব্যূহ ভেদ করে তবুও তো ও স্পন্দমান

আবেগে কম্পনে অনুভূতিতে প্রেমে

ভক্তিতে ও ভালবাসায়।

আমার প্রশ্ন তাই অসীম

ব্যপ্ত ভূমায়

তিনশো বছরে তিনশো ডিম্ব নিঃসরণের

পর

এখনও তোমার জরায়ু অফুরন্ত

ঋতুমতী

গর্ভের ক্রন্দন কি চিরন্তন ?

তোমার ?

স্নান করো পূর্ণকুম্ভে

আমার হৃদয় এখন শূন্য, নিস্তব্ধ রাজপথ
মধ্যরাতের শীতল গর্ভে, সব ভালোবাসা দেওয়া হয়ে গিয়েছে
উজাড় করে। অমৃত কুম্ভের পূর্ণপাত্র
দেবতাদের প্রতিনিধি হয়ে পান করে গেলে তুমি
নিঃশেষে, গরবে, হরষে।

প্রেয়সী, অমাবস্যার রাতে
হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাঝরাতে,—গভীর অমাবস্যায়
সেদিন, সেই যে কৃষ্ণপক্ষে
অন্ধকার যেদিন পূর্ণ পোয়াতির মত অপেক্ষা করছিল
পরদিন সাঁঝের বেলায় চাঁদের টুকরো
 দেখবে বলে—

সেই নিশুতি গভীরে আমি একা ছিলাম না
ছিলে তুমি দেবারতি, আর তারার ফুলকিরা।

স্নাত, সিক্ত গর্ভদেশে
আমি তখন এক উন্মাদ হরিণ।
তাকিও না, লক্ষ্মীটি, তাকিও না,
তোমার লজ্জা হয়ে আমি লোভে
 উদাসীন।

দেবতার আরতি সাজিয়ে
 হে দেবদাসী,
 পূর্ণকুম্ভে স্নান করো,
নিঃশেষে, গরবে, হরষে।

দিনের মিছিলের শেষ লোকটির চলে যাওয়া
আমার বড় মনে পড়ে। বড় ক্লান্ত সে।
সারাদিনে জুটেছে দুটো আটার রুটি
আর একটু শুকনো তরকারি।
ও আমার বড় চেনা, আমার ফেলে আসা
ক্লান্ত শৈশব। শহর দেখা হল, হল গান, আনন্দ
আনন্দের রেশ নিয়ে তার এখনও স্নান বাকি।

দেবারতি, দেবদাসী, পূর্ণ করো আমাকে
সদম্ভে, সদর্পে—এক পূণ্যস্নানে।

কথা নয়, কথকতা

প্রিয়...

একেবারে কিছুই না পাওয়ার থেকে কিছুটা পাওয়াও খারাপ নয়। এক তো শূন্যের অন্তত কিছুটা উপরে। নাকের বদলে নরুন কি তালের বদলে তিল কিংবা মাঠের বদলে ঘাট। যা পাই তা-ই সই। বক্তৃতা শোনার অধ্যায় থেকে বক্তৃতা দেওয়ার ধাপে পৌঁছতে কিছুটা সময় লাগে, লাগে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি এবং জাড্য অতিক্রম করার ক্ষমতা—স্থিতিজাড্য থেকে গতিজাড্যে রূপান্তরিত হওয়া। শূন্য ডিগ্রীর বরফ আর শূন্য ডিগ্রীর জল এক নয়, যেমন নয় স্ফুটনাঙ্কের জল আর সম তাপমাত্রার বাষ্প। সঙ্গে থাকে কিছু যোগ বা বিয়োগ। তা লীন। রূপান্তরে তার ভূমিকা কিছুমাত্র কম তো নয়ই, বরং একান্ত প্রয়োজনীয়। এটা সঞ্চয় করতে করতে দর্শকবৃন্দের পিছনের সারি থেকে আস্তে আস্তে এগোতে হয় সামনের সারির দিকে, আর তারপর মঞ্চের উপরে। মঞ্চের উপর থেকে, ফেলে-আসা জায়গা যাঁরা নতুন করে ভর্তি করলেন, তাঁদের দিকে তাকালে অনুভূতি বদলে যায়। ছাত্রের প্রথম শিক্ষক হওয়ার মতোই অনুভূতি সেটা, তখন এক এক দর্শক এক এক ভাবে ফুটে ওঠেন, তাঁদের মুখের রেখায় ফুটে ওঠে বিভিন্ন ধরনের আনুবিক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। এ দেখাও এক মজায় খেলা। সব দেখারই চোখ থাকা চাই, আরও গভীর ভাবে থাকা চাই মনের ক্ষমতা যার যৌগিক কম্পিউটার বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করবে ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়াকে, ঘাত আর প্রতিঘাতকে। ব্যাপারটা বেশ সিঁড়ি-ভাঙা অঙ্কের মতো, বা আরও কঠিন করে বললে, নীলস্ বোরকে পার হয়ে শ্রয়ডিঙ্গার-এ এসে, তার সঙ্গে নিউটন, আইনস্টাইন, হয়েলন নারলিকার সবাইকে খাপ খাইয়ে সমাধান খোঁজার প্রচেষ্টার মতো। কখনও প্রচেষ্টা সমান্তরাল, কখনও উল্লম্ব; কখনও বা অনুভূমিক। পিকাসোর কিউবিক রূপরেখার মতো টুকরো টুকরো ফল। যোগে পূর্ণতা। যামিনীবাবুর মতো সরলরেখার সমাধান হলে তো কিছুই বলার ছিল না। কিন্তু সেটি হবার নয়। পৃথিবীর কোনও দুটি মানুষ হুবহু এক নয়। কারণ কি না সেই ছোট্ট সুতোর মতো সাজানো যে জিনিসটি বংশপরম্পরায়, বা কখনও প্রকৃতির খেয়ালে

মানুষ পেয়েছে তার গঠন প্রকৃতির সমন্বয় যা নাকি প্রত্যেক জীবনের ক্ষেত্রেই একটু আলাদা হলেও আলাদাই। এ বড় জটিল। তবুও সত্যি। তাই কখনও A-র পরে G, কখনও বা T, আবার কখনও বা C। দুদিকে প্যাঁচানো সেই প্রাণভোমরার উল্টোদিকে এদের খেয়ালখুশি মতো ছড়িয়ে থাকা। কার খেয়াল? তাতো জনা নেই। জানা আছে শুধু কবে কোন বিস্মৃত প্রদোষে তা হয়ে গেছে। মজা শুধু দেখে, কার কী প্রতিক্রিয়া তা দেখে। আর যিনি মঞ্চের উপরে বা টেবিলটার অন্য দিকে বসে আছেন তিনি কাকে কী প্রতিক্রিয়ায় দেখছেন তাতে। বিপরীতমুখী স্রোত উল্টো বহতা। মিল হয় কদাচিৎ। হয়, যখন সবার চাওয়া এক হয়। আড়াল থেকে যিনি কলকাঠি নাড়েন, তাঁর চাওয়ার উপরই সব নির্ভর করে। আজ এই পর্যন্তই। তারিখ দিলাম না। দিতে ভালো লাগল না।

*　　　*　　　*

অধ্যায়—২

আমাকে আঘাত দিয়ে তো তুমি কষ্টই পাও, তবু, আঘাত দাও কেন? কত কথা বলব ভাবি. সময় ফুরিয়ে যায়। যা বললাম, তার থেকেও তো আরও অনেক কিছু বলার ছিল। ফিরে গেলাম যা বলতে পারলাম না, তা বলার দুঃখে নিয়ে, অতৃপ্তি বহন করে। ভাবি, পরের দিন নিশ্চয়ই বলব। পরের দিনের শেষেও দেখি, আরও অনেক কিছুই না বলা রয়ে গেল। বলি আর নাই বলি, পেলাম অনেক। সত্যিই এ আমার অনেক পাওয়া। আমার শূন্যস্থান, আমার অভাব অভিযোগ সবই ঈশ্বর চিরকালই খুঁটিয়ে দেখে এসেছেন, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বড় দেরীতে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। আবার এই আমার আক্ষেপ আমার ট্র্যাজেডি। তবু যা পেয়েছি, আমি তাতেই কৃতজ্ঞ। আমি জানি না, কেমন করে এটা হল। কেমন করে তোমারই বা তা হল—একই সাথে, প্রায় একই ভাবে। কত কত না-জানা জিনিষ থেকে যায়। এ-ও তাই। কোনদিনই হয়তো জানা হয়ে উঠবে না, বোঝাও যাবে না। শুধু দাগ থেকে যাবে, অনেক অনেক গভীরে। অতলান্ত সমুদ্রের তলা থেকে কিছু কুড়িয়ে আনা যায় না, অতি উচ্চচাপ ফুসফুস ফাটিয়ে রক্ত বার করে দেয়, যক্ষ্মারোগের মতো একটু করে নয় - একেবারে বাঁধভাঙা স্রোতের মতো, পাহাড়ের উপর থেকে বাধা ভেঙে ভেসে পড়া, লাফিয়ে পড়া ঝর্ণাটির মতো। দাগ পড়ার আগে বোঝা যায় না, দাগ পড়লে বোঝা যায়।

জামায় আতর ঘসা দেখছো? ফোঁটা করে লাগিয়ে দিলেই দাগ পড়বে—আঙ্গুলে ঘসে লাগালে দাগ থাকবে না, থাকবে সুঘ্রাণটুকু। দুয়ে দুয়ে চার। দাগও নেই, গন্ধও আছে। এ সেই মাছিও পড়লো না, কিন্তু গুড় খেলাম। সহজিয়া ছন্দে, জলে নামলাম, কিন্তু চুল ভিজল না। অনেকটা শান্তনু-পত্নী গঙ্গার পা না ভিজিয়ে নিজের অনন্ত রূপে প্রবেশ করার মতো। এতে কিন্তু এসব সুবিধে নেই। দাগ থাকবেই, শুধু পাঁচজনের মনে না থেকে নিজের মনে, আর, আর একটি পক্ষের মনে। বস্তুর সাথে ছায়া যদি পুরোপুরি সমান না হয় তাহলে কি আয়না ভাল হয়? না, সে আয়নায় ত্রুটি নিশ্চয়ই আছে। আর যদি বস্তু আর ছায়া একই মাপের হয়? একেবারে বেলজিয়াম কাঁচ। যা আগের দিনের স্বদেশী রাজা মহারাজা নবাবরা কিনতেন—অনেক অনেক অন্যের পয়সা-র বিনময়ে। তবু, দুঃখ যাই থাকুক সে কাঁচের পিছনে, সুন্দর কাঁচ চোখ চেয়ে দেখার মতোই। তাই গভীর ভালবাসা চোখ জুড়োয়। কাকচক্ষু জল নাকি এর ঠিক তুলনা। এ কাব্যে। মনের গহনে এর রূপ পুরোপুরি তুল্য-মূল্য নয়। দর্পণেই হোক, আর তোমাদের সেই কাকচক্ষু জলেই হোক, বস্তু দাঁড়ালে তবেই ছায়া। কিন্তু মনে, বস্তু ছাড়াই ছায়া—এ পক্ষের ও পক্ষের দুয়েরই। তবে, এ-তো বড় ভৌতিক ব্যাপার হল—কিংবা ইন্দ্রজাল। বস্তু নেই, ছায়া আছে। এ ব্যাখ্যার অতীত, এ সুন্দর, এ মনোরম। এই-ই অমরাবতী, এই-ই ঐশ্বর্য্য, এই-ই কাম্য। এই ই পক্ষ, এই-ই আবার প্রতিপক্ষ। এই-ই আমি, এই-ই তুমি। একে একে দুই। এক এক্কে এক নয়। রূপের সন্ধান অরূপে, ভাষার সন্ধান ছন্দে—ধবধবে সাদা বা টুকটুকে লাল কাগজে নয়—মনের মাঝারে।

বড় বেশি বাজে বকি না? হ্যা হ্যা করে হাসি, বকবক করে বকি, প্যাট প্যাট করে দেখি। শুধুই এই কটা দ্বিগু সমাস? আর কিছু নয়? কেন শুধু আমি কেন? তুমি বল না? আবার তোমার কথাতেই, অনেক কথাই বলব না ভাবলেও কথার গতিতে স্বরের চাপল্যে বেরিয়ে পড়ে। বাপু হে, চুপ কর। দু পাতা বই পড়েছে বলে ভেবে নিয়েছ, সব কথাই কি বাক্যিতে বলতে হয়? না বাপু না। আমিও তেমন করেই বলি, রেখে ঢেকেবলি, যে শোনার সে শোনে, শুনে যে বোঝার সে-ই বোঝে। এ ভাষা তো তারই তরে। তাই তো গো, বলি গো বলি, আরও আরও অনেক বড় দুষ্টুটি তুমি, নিজের গদীটিতে বসে কিসের অহংকার তোমার? এ অহংকার ক্ষমতার নয়, এ অহংকার অন্যকে তাচ্ছিল্য করার তরে নয়—এ অহংকার গর্বে নয়, —আস্থায় ও আত্মবিশ্বাসে। তাই তো ভাবি, এত সহজে টেবিলের নীচ থেকে সরাসরি দৃষ্টি কি করে চলে

আসে সোজা থেকে একটু উপরে ঠেঁকে একেবারে সাইনাসে ? সোজা বলতে টেবিল থেকে থেকে মাথা পর্যন্ত অংশটার মোটামুটি মাঝ বরাবর। জ্যামিতিতে মধ্যমা টানা আর কি। তা বাপু, কানে কানে স্বীকার করি, এই দুষ্টুমি শুনতে খারাপ হলেও, ভাবতে ভালো, উপলব্ধি করতে ভালো. কেননা ওই তাকানো, ওই ছোঁয়া যে ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে একেবারে হৃদ্‌পিণ্ডে ধাক্কা দেয়। মনে ততক্ষণে কৌতুকের খেলা। যাচাই করে নেওয়ার আগ্রহ। তাই মোটামুটি সামান্য ওঠা কৌণিক চাউনিতে অপর পক্ষের চোখের খুঁটিনাটি জরিপ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, অসভ্য, অসভ্য, অসভ্য। তবে শুধুই অসভ্য নয়। মুগ্ধ এবং অসভ্য। আবার বাবুটি ভাবলেন কি ? লজ্জা পেলেন—ভাবলেন অন্য পক্ষ দেখে ফেলতে পারে, না কি অন্য পক্ষের 'দৃষ্টি জরিপী ভাই সাবধানী হলেন—না কি এও লজ্জা ? হুঁ, আবার লজ্জা দেখানো হচ্ছে ? এতক্ষণে তো যা হবার হয়েই গেছে। স্বর্গের যে দুধ সাগরে কেউ এতদিন একটা ইঁট ছুঁড়ে সাগরের নীরবতায় ছেদ ঘটাতে পারলো না, তুমি তো বাপু এক লহমায় তাই করে ফেললে। তবে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল ? অসভ্যতায় বিরক্ত—আর মুগ্ধ অসভ্যতায় মোহিত ? জানি না বাপু। রক্তে এখন বড় ভাঙচুর চলছে, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রীতে হঠাৎ নতুন কোন 'খবর' এসেছে আর মস্তিষ্কের পরিপোষক কোষগুলি দেহের ও মনের কোষগুলিকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় প্রয়োজনীয় তথ্য ও উত্তর সরবরাহ করে চলেছে। এতশত বিশ্লেষণ করার শক্তি আমার নেই। আমি দলিত, দর্পচূর্ণ হওয়ায়—ও পক্ষের নয়, স্বপক্ষের। আমি মথিত দামাল দুষ্টুপনায়, আমি অভিভূত এক সর্বগ্রাসী মুগ্ধতায় যা আমার সর্বকে গ্রাস করে কিন্তু বিশ্বাস হয় সর্বজনকে মুগ্ধ করতে তা উদাসীন নিস্পৃহ। কেষ্টঠাকুরটি ননীচোর রূপে জ্ঞাত নন—তবে 'বর্ণচোরা আমি' তো বটেই।

এ তো গেল তোমার কথা। এবার বাপু, পালাও কোথা ? আমার কথা না শুনিয়ে ছাড়ছি না। শোনাব বলেই না এত গাওনা, কিছু পাওনা-র জন্যে গাওনা কি না জানি না, তবে কিছু কিছু জিনিষ আছে যা নিবেদনেও সুখ ; ফিরতি প্রাপ্তির কথা না ভেবেও। তাই তো সাজিয়ে বসি গানের ডালি, ছড়ার কলি আর সুরের সুরময়তা। এ সুর আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, এ নিবেদন নিবেদনেই পূর্ণ। কোনদিন নির্দ্দিষ্ট কাউকে শোনাব ভাবি নি, শুনিয়ে কাউকে বশ করব ভাবি নি, অর্থাৎ কিনা, আইনী ভাষায়, কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আদালতে বলে আইনজীবিরা—intention বা motive. খাঁটি দুধে এক ফোঁটা নোংরা পড়লেই দুধ কেটে যায়, দুধের সাদা-য় ভ্যাম্‌পায়ারের কালো ডানা ভর

করে। তাই বাবা, উদ্দেশ্য বল বা motive বল, তা আমার নেই। গানের ডালি গেয়েই গেছি, হঠাৎ একদিন দেখি কি ...। কী দেখি বলো তো? বলতে পার, কিন্তু বলবে না। আহা রে, বড় লজ্জা। ও বাপুরে, লাজ কিসের, সরম কিসের? তবে কি লাজ-লজ্জা বিসর্জন দিয়ে হাটের মাঝে বে-আব্রু বসতে হবে নাকি? নারে বাবা না। লাজ যে তোমার আবরণ, লজ্জা যে ভূষণ। তবে কি না, লাজের চপলতা বল বা লজ্জার মিষ্টত্ব বল, মিষ্টির সার্থকতা জিভের তৃপ্তি এনে, সাজের সার্থকতা মনের মানুষটার হারিয়ে যাওয়া মনটাকে আরও আরও হারিয়ে দিয়ে আর তেমনিই, নদী সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়ার মতো করে তোমার লাজ বল আর লজ্জাই বল, গুণ বল আর দোষই বল, রূপ বল আর কুরূপ বল সব আমাতে হারাবে। কেন, কেন আমাতে হারাবে কেন? আমি কি বিশ্বরূপ? বিশ্বরূপে তো সবাই-ই হারিয়ে বসে আছে, তুমি-আমি, চারপাশের আর আর-রা সবাই। ওতে নতুন করে হারানোর তাই কিছু নেই। আমাতে হারাবে কেননা আমি তোমার সেই যে কি যেন বলেছিল ভুবনডাঙার হাটে, বোলপুরের মেলায় পাগল করে দেওয়া সেই বাউলটা, 'মনের মানুষ।' কে হয় মনের মানুষ? মন যাকে চায়, যাকে না পেলেও চায়, পেলে আরও গভীরভাবে চায়। মনের কোন শরিক হয় না, হতে পারে না। যে করে, সে প্রতারক। থুড়ি, এ শুধু মানুষের বেলায়। ব্যতিক্রম শুধু তিনি যিঁনি সবার। হ্যাঁ, কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একদিন দেখি কি · থাক্, আমিই বলে দিই। দেখি কি, এতদিন যে শব্দ মিলিয়ে যেত আদি-অন্ত রূপের মধ্যে শূন্যের মধ্যে, এবং ক্রমশই মহাশূন্যের দিকে ধাবিত হত তা প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল। তবে কি, শূন্যে, কোন গ্রহে মানুষ আছে কি না পরখ করার জন্যে যে তরঙ্গ আমার পার্থিব স্টেশন ক্রমাগত পাঠাচ্ছিল, তা উত্তর হয়ে ফিরে এল অনেকদিন ধরে সাজিয়ে রাখা যন্ত্রটিতে? 'ইউরেকা, ইউরেকা।' বিখ্যাত শব্দ সাধারণ অর্থ, অপরিসীম ব্যঞ্জনা। পেরেছি, পেয়ে গেছি। কি পেয়েছি? যা চেয়েছিলাম তা-ই। কি চেয়েছিলাম? এখানেই আর কোন সঠিক উত্তর নেই। শুধুই কি শূন্যে বা অন্যগ্রহে আমার কথায় সঠিক অর্থ বোঝাবার মত আর একটি জীব-এরই সন্ধান আমি করছিলাম? আর্কিমিডিস চেয়েছিলেন ব্যাখ্যা। চান করতে গিয়ে ওর ভরতি চৌবাচ্চার জল উপচে পড়লো কেন, তার ব্যাখ্যা। নিউটন চেয়েছিলেন, আপেলটা গাছ থেকে উপর দিকে না গিয়ে নীচে কেন নেমে এল, তার ব্যাখ্যা। কেপলার চেয়েছিলেন, নির্দিষ্ট সময় পর পর কেন সূর্য্যকে এবং চাঁদকে দেখা যায় তার ব্যাখ্যা। উঁহু, শুধু ঘটনার ব্যাখ্যা চাইলেই হয় না। নিজের মন তৈরী থাকলে

তবেই ব্যাখ্যার উত্তর নিজের কাছে মেলে, হয় আবিষ্কার। তাই খুঁজতে খুঁজতে, বিশ্লেষণ করতে করতে তৈরী হয় তত্ত্ব বা hypothesis যা প্রমাণাভাবে তখনও পর্য্যন্ত নীতি বা theory-র মর্যাদা পায় না। তখনই এটা নীতি বলে ধরা হয় যখন ব্যাখ্যাটি অন্যান্য স্বীকৃত ঘটনার সাথে বিরোধে লিপ্ত না হয়ে পরিপূরক হয়ে দাঁড়ায়। তাই 'ইউরেকা'-র মানে শুধু 'পেয়ে গেছি' নয়, বৃহত্তর ব্যঞ্জনায়, যা খুঁজেছিলাম তাই পেয়ে গেছি। দেখা থেকে খুঁজে খুঁজে এলাম তত্ত্বে, চূড়ান্ত খোঁজা কিন্তু নীতিতে। নীতি মানে principle নয়, theory। খুঁজেছিলাম তাকে যাকে না হলে আমার নাওয়া খাওয়া শিকেয় উঠছিল, পার্থিব কাজের কোন মূল্য থাকছিল না। আগ্রাসী সৈন্যদলের জিজ্ঞাসার উত্তরে নির্বিকার অথচ বিরক্ত ভাবে বলতে পেরেছিলাম, একটু পাশ দিয়ে ছোটো, দাগগুলো মুছো না। দাগগুলো অনেকদিনের সাধনার। তাই দুর্বৃত্তরা, অবোধেরা মুছে দিলে রাগ হবে, অনেক বিনিদ্র রজনীর সাধনা বৃথা যাবে। আমিও খুঁজছিলাম, আমার শব্দ বোঝার মতো মানুষটিকে। হঠাৎই প্রতিধ্বনি কানে এল—প্রতিধ্বনি আমার পাঠানো শব্দের। পর মুহূর্তেই এল পাঠানো ধ্বনি। আরে ভাষা যে হুবহু এক, বোল এক, তাল, লয় সব এক। এবার আর প্রতিধ্বনি নয়, ধ্বনির উত্তর ধ্বনিতে, সুরের উত্তর সুরে, রাগের উত্তর পরিপূরক রাগিণীতে, ব্যথার উত্তর সমবেদনায়, কাঁদার উত্তর আশ্রয় দানের অভয় মন্ত্রে, অভিমানের উত্তর সমর্পণে গাঢ় ও প্রগাঢ় অনুভূতিমিশ্রিত চুম্বনে, সঙ্গের কামনার উত্তর আসঙ্গের আকুতিতে। তাই এক্ষেত্রেও 'ইউরেকা'। সেই কবে এক পাগল বিজ্ঞানী এই শব্দটা বলতে বলতে চানের টব থেকে পারিপার্শ্বিক ভুলে জন্মদিনের পোশাকে এক ছুটে নেমে গেলেন রাজপথে। লোকে দেখল, বিজ্ঞানের জগতে বিপ্লবের সূচনা ঘটল। আবার ঐ একই শব্দ উচ্চারণেও বিপ্লব এল—আমার মনে। প্রচারিত ধর্ম কেউ গ্রহণ না করলে ধর্মযাজকের সার্থকতা থাকে না, সহাবস্থান কথাটা যতই শ্রুতিমধুর হোক বা না কেন, আমার বিশ্বাসে অন্যের আস্থাতেই আমার বিশ্বাসের সার্থকতা—এ তাঁরাও মনে করেন। আর আমি তো কোন ছা-পোষা কেষ্টর অনেক জীবের একটা। আমি তো চাইবই, আমার নিবেদন পরিপূর্ণ হোক গ্রহণে। সে গ্রহণ আমার বুদ্ধির প্রকোষ্ঠে ধরা দিল, তাই আমার আনন্দ, আমার 'ইউরেকা', আমার আস্বাদের তৃপ্তি।

নিজের বক-বকানিগুলো আরও বেশী করে শোনাবো বলে কলম ধরেছিলাম। কিন্তু যতই লিখি না কেন, মনে হয় ঠিক কথাটি বলা হল না,

ঠিক অনুভূতিটি প্রকাশ হলো না। তাই লেখা হাতে তুলে দিতে গিয়েও একই অতৃপ্তি থেকে যায়। লেখা শুরু করার সময়টিতে যতটা ছিল. ঠিক ততটাই। আসলে শুধু কলম দিয়েই যদি সব হয়ে যাবে তাহলে আর চোখ আছে কেন, কান আছে কেন, হাত আছে কেন, পা আছে কেন, মুখ আছে কেন, ঠোঁট আছে কেন। আরে এতেও তো হল না। এ'ও বিজ্ঞান। সব সমস্যাই যেমন অংকে সমীকরণ নয়, বরং সমীকরণও কখনও কখনও সমাধানের একটা উপায়, তেমনই রসায়নশাস্ত্রে এবং পদার্থবিদ্যায় অণু-পরমাণু দিয়ে যখন সবকিছু ব্যাখ্যা করা যায় না, এখন খুঁজতে খুঁজতে অন্য কোন শক্তির অস্তিত্ব বার করা হয়। আমিও তাই দেখলাম, যখন এত কিছু করেও ঠিক কথাটি বলে ফেললাম, এমন তৃপ্তি পাচ্ছি .যে, মনে হচ্ছে আরও একটি মহাশক্তিধর আপাত অদৃশ্য বার্তা রয়ে গেছে। খুঁজতে খুঁজতে বুঝলাম, এটিকেই মন বলে—শুদ্ধ কাব্যিক ভাষায় হৃদয়। তাই একে কোন ইন্দ্রিয়ের সংজ্ঞার মধ্যে ফেলা হয়নি। বুঝলাম, কিছু কথা মন থেকে বলতে হবে, শোনাতে হবে অন্যমনকে, পৌঁছোতে হবে অন্য হৃদয়ে। এটা কি অশুদ্ধ অনুপ্রাস ? হোক গে। আমি তো বৈয়াকরণদের শোনাতে বসি নি, বলতেও যাই নি। বলতে চেয়েছি তাকে, শোনাতে চেয়েছিও তাকে, যে প্রচালিত ব্যাকরণ ছাড়াই আমার কথার মানে পুরোপুরি বুঝবে। আসলে, এ শাস্ত্রের কোন বাঁধাধরা ব্যাকরণ নেই। ব্যাকরণ নেই মানে নিয়মও নেই, আর নিয়ম নেই বলে আনন্দ আছে। শৃঙ্খলাবিহীন শৃঙ্খলার চরম উপভোগটি আছে।

বসেছিলাম শোনাব বলে। সারাদিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম, শোনানোর জন্যে আর শোনার জন্যে আকারটুকু, এমনকি ছায়ার আকারটুকু দেখলেও যাকে চিনতে আমার কোন অসুবিধে কোনদিনই হবে না, তাকে দেখেও, বুঝেও থমকাচ্ছিলাম।

সেদিন বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলাম—যতই সহজ হওয়ার চেষ্টা করি না কেন, বিচ্ছেদের আশংকা আমাকে ব্যাকুল করে তুলছিল। কোথায় যেন কেটে যাচ্ছিল সুরে বাঁধা সুর। কামনা করতে লাগলাম, বিশ্রামের বিচ্ছেদকে নয়, শ্রমের মিলনকে। বিশ্রামকে এতদিন দেখে এসেছি প্রথামাফিক কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে গোগ্রাসে পুজো সংখ্যা গেলার মধ্যে, প্রচলিত একঘেঁয়ে জায়গা থেকে কয়েকটা দিনের জন্যে প্রকৃতির অন্যরূপের মধ্যে। অদ্ভুত না, এবার এর কোনটাই আমাকে টানতে পারছে না। পুজো সংখ্যার উপন্যাসগুলো তাকেই পড়ে থাকছে, কখনো সখনো বয়ে নিয়ে আসা একটা পত্রিকার একগল্প

ও-গল্প থেকে এপাতা ওপাতা ওল্টানোর চেষ্টা যে করা হয়নি তা নয়। কিন্তু একেবারে স্বতন্ত্র এবারের অভিজ্ঞতা। সম্পূর্ণ হচ্ছে না কোনটাই—বরং একটু পড়তে পড়তেই মন চলে যাচ্ছে লেখককে ছেড়ে, সৃষ্ট বা উপস্থাপিত চরিত্রদের ছেড়ে সম্পূর্ণ অন্য একটি চরিত্রের মধ্যে। এ চরিত্র ছায়া হয়ে, রূপহয়ে, বাসনা হয়ে, আকাঙ্খা হয়ে, প্যায়েলিয়া-র বোল হয়ে টানছে আমাকে। তাই এত বড় বড় লেখক বা কবিরাও হার মেনে যাচ্ছেন। টানতেপারছেন না এবার। কে সেই চরিত্র, কার সেই রূপ? কার সেই মাধ্যাকর্ষণ যা নিজের আকর্ষনে অন্য সবকিছুকে তুচ্ছ করে নিজের বুকে টেনে নিচ্ছে? রাজস্থান গুজরাটের ধূ ধূ বালি, গোয়ার সমুদ্রতীর, দমনের কালো বালি, কাশ্মীরের বরফ, কেদার বদ্রী গাঙ্গাত্রী যমুনোত্রীর উচ্চতা ও বন্ধুর পথের আকর্ষণ, হিমালয়ের সুখী উপত্যকায় চিরবসন্ত, টেথিস থেকে ক্রমশঃ সরে আসা এককালের গণ্ডোয়ানা-ল্যাণ্ড আর একালের মধ্যভারতবর্ষের উচ্চ মালভূমির উপর দিয়ে নর্মদার বয়ে চলা আমাকে দেখতে হবে বলেই তো ঠিক করেছিলাম। কিন্তু মন যার অন্যত্র সুপার ফাষ্ট রেলগাড়ির গতিময়তা, লোনা আরবসাগরের কুল ঘেঁষে বহুতল-বাড়ীর বাতানুকুল স্বাচ্ছন্দ্য, না-দেখা গোয়ার সমুদ্র সৈকত এবং রোদকে হিংসে করা কিছুই তাকে টানতে পারে না। আবার টান যার বেশী, বস্তু সে দিকেই বেশী ছোটে। এও নিউটন। আবার দুই বা ততোধিক বলের সামঞ্জস্য ও দিকের গতিময়তা তাও নিউটন। আরও মধুর কোন বেড়ানোর জন্যে মধুর কোন উষ্ণতার জন্যে সুমধুর কোন উত্তাপের জন্যে সুললিত কোন ছান্দিক শরীর আবর্তনের জন্যে মন উন্মুখ হয়ে থাকে। যার বল বেশী সেই জেতে। দেয়ালের রুক্ষতা থেকে সুন্দর ফুলের উপর নেচে গেয়ে, পাখা ছড়িয়ে বেড়ানোতেই প্রজাপতির আনন্দ। কে ধন্য, প্রজাপতি না ফুল? ধন্য দুজনেই। প্রজাপতি ধন্য, সুন্দর ফুলটি তাকে হেসে খেলে বেড়াতে দিয়েছে বলেই শুধু নয়—প্রজা-পতির কাছে অমৃতসম মধু ফোঁটা ফোঁটা করে তাকে নিজের বুকথেকে পান করিয়ে তার জীবনীশক্তি বজায় রেখেছে বলে। আর, ফুল ধন্য, নানারঙের বাহারী প্রজাপতিটি তার উপরেই ডানা মেলে বসেছে বলে, তার উপরেই খেলা করছে বলে। শুধু এখানেই শেষ নয়, ঐ যে বলে না, খেতে দিলে শুতে চায়। জামাই আদর আর কি। প্রজাপতির অবস্থাও তাই। শুধু বুকের জমানো অমৃত শুষে তার তৃপ্তি নেই। শান্তি নেই, আবার আদুল বুকের উষ্ণতা উপভোগ করতে করতে নিদ্রাটুকুও চাই। থুড়ি, আদরটা ঠিক জামাই আদর নয়, বরং এ সোহাগ বড় মিষ্টি সোহাগ। আরও কেউ, কেউ ধন্য। তারা রাধা-কেষ্টর লীলার কথা শুনতে শুনতে চোখের জলে বুক ভিজিয়ে ফেলে, তারা কথকের

কথকতা শুনতে শুনতে মুরলীধ্বনি শুনতে পায়, তারা রাধা অভিসারে যাওয়ার সময় ছি ছি করে ওঠে না, রাধাকে পিছু ডাকেনা অমঙ্গলেরআশঙ্কায়। বরং নিধুবনে রাধা যখন কেষ্ট ঠাকুরটির ডাকশুনে থাকতে না পেরে শুধু নয়, ডাকের মর্যাদা রাখতে কুল ফেলে ছুটে আসেন, দয়িতের বাঁশীর সুরের লুকোচুরির সাথে সাথে দয়িতকে খুঁজে বেড়ান এবং সবশেষে শ্যামরংয়ের বুকের উপর গোরা মাথাটা পরম নিশ্চিন্তে এলিয়ে পড়েন. তখন তাঁরা আনন্দে আপ্লুত হয়ে ওঠেন, সাধু সাধু করেন চিরন্তন প্রেমের। প্রেমের আকুতির আবেগের, উচ্ছাসের, আকুলতার, এমনকি রচয়িতার এবং কথকেরও এরা রসিক। তুমি কি আমাদের সনাতনী বাংলার এরূপ দেখেছ? না দেখে থাকলে এদেখা দেখার কামনা করো। এরূপ মিষ্টি নয়, তবে মধুর। এরূপ স্বর্গের অমরাবতীর অমৃতধারা। তবে এরূপ ক-জনই বা সত্যি সত্যি ধরে রাখতে পেরেছে বল। কান্না অনেক সময় দেবতার প্রেমলীলা ভেবে, সমালোচনার জিনিষ নয় ভেবে জল হয়ে ঝরে পড়ে, অশ্রু হয়ে নয়। অভিধানে আক্ষরিকভাবে অর্থ যাই লেখা থাকুক না কেন, কান্না আর অশ্রু এক ব্যঞ্জনায় উচ্চারিত হতে পারে না। কান্না নিছকই চোখের একটি বিশেষ গ্ল্যাণ্ডের ক্ষরণ, আর অশ্রু? ডাক্তাররা যাই বলুন, আমার কাছে এ শুধু চোখের গ্ল্যাণ্ডের ক্ষরণ নয়, এর সাথে মনের ভিতরে আবিষ্কার করতে না-পারা এক বা একাধিক গ্ল্যাণ্ডের ক্ষরণের মিশ্রণ। এই মিশ্রণের নাম আবেগ। চোখের জল তখনই অশ্রু হয়, যখন তাতে সুখ থাকে অথবা দুঃখ থাকে কিংবা ব্যথা থাকে—যদিও তা শারীরিক নয়। এই আবেগ, অশ্রু হয়ে পুষ্পবৃষ্টি করে। যখন কৃষ্ণ আর রাধাকে দুটো তোমার একান্ত চেনা কোন মানব-মানব ভাবতে পারবে, তখনই তাঁদের অভিসার, তাঁদের আবেগ, তাঁদের আকুতি, তাঁদের কামনা, তাঁদের বাসনা, তাঁদের মুক্তি, তাঁদের উত্তরণ তোমার কাছে নান্দনিক রূপ নেবে। অন্যথায় তাঁরা শুধুই দেবতা, তখন তাঁদের বাস স্বর্গে। কিন্তু আমরা মর্ত্যের। স্বর্গ দেবতাদেরই সুখস্থান, আমরা সেখানে পরবাসী। আর এই পৃথিবী? এ স্বর্গভূমি নয়। কিন্তু এ মাতৃভূমি। কৃষ্ণ-রাধা যতক্ষণ দেবতা, ততক্ষণ তাঁরা স্বর্গলোকের, কল্পলোকের। আর যখন তাঁরা আদম ও ইভ, মানব ও মানবী, আদি পুরুষ ও আদি নারী, তখন তাঁরা মাতৃভূমির—তখন তাঁরা বড় কাছের, বড় আপনার। যিনি কৃষ্ণ-রাধাকে এই কাছের লোকের মত করে দেখা উপভোগ করতে পেরেছেন, পুরাণ তাঁর কাছে ধন্য, মানুষ তাঁর কাছে ঋণী। ক্ষণিকের আসরে এমন লোকের সাক্ষাতও পেয়ে গেছি। তবে বড় অল্প বয়সে এবং বড় অল্প সময়ের জন্যে। তখনও তাঁকে বোঝার মত মন আমার তৈরী হয়ে ওঠেনি। একতারায়

একটি মাত্র তারের টানের মধ্যে এ গভীর তান কোথা থেকে ভেসে আসে সে কৌতূহলই বোধ হয় বেশী ছিল। তবে, মানুষ তো। কৌতূহল মেটানোর দায় বড় দায়। কিন্তু বিশ্বাস কর, একটা টানেই বুঝেছিলাম, গভীর সমুদ্রের অন্তলান্তে অথবা পৃথিবীর গর্ভদেশে যেখানে উত্তাপ নাকি পদার্থবিদ ও ভূতাত্তিকদের হিসেবে প্রায় ৫ কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, সেখানে খোঁজ করতে হবে। কিন্তু তা তো হবার নয়। এ দুটো জায়গার কোনটাতেই তো আমি বেঁচে থেকে যেতে পারবো না। তবে কোথায় খুঁজি তারে? ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করেছিলেন, সবচেয়ে গভীর কি এবং সবচেয়ে দুর্বোধ্য কি? উত্তর মানুষের মন। আমাকে তো সম্ভাব্য জায়গাতেই খুঁজতে হবে। পেয়ে গেলাম। এ গভীর আওয়াজ বোধহয় আমার মনে, যে বাজায় তার মনে, যে আকুল হয় তার মনে। তা নয়তো কি? এত বড় বড় গালভারি নামের আর দেখনবাহারের বাজনা থাকতে গম্ভীর লাগলো কি না খোলে একটা মোটে তার দিয়ে, তার মাথাটা এক হাতে ধরে, একহাতের টান দিয়ে-বার করা আওয়াজটাকেই? সে প্রশ্ন আমাকে করো না। উত্তর আমি জানি না। জানি, ঘটনাটুকু আর তার ফলটুকু। ঈশপের নীতিকথা নয়। আমার মনের কথা। নীতিকথার কিছু উদ্দেশ্য আছে, যেমন আছে ধর্মযাজকদের ধর্মপ্রচারের। মোদ্দা লক্ষ্যটা হল, নিজের দল ভারী করা। শুনতে খারাপ লাগলেও, চিরাচরিত সংস্কার বহির্ভূত হলেও বস্তবাদী দুনিয়ার ব্যাখ্যায় তাই। সে আর এক গল্প। বরং গল্প নয়, কাহিনী। কাহিনী-ই বা বলি কেন, কাব্য, কিংবা দর্শন। দর্শন কার? প্লেটো সক্রেটিস, কান্ট, হেগেল এত বড় বড় কারুর নয়, চৈতন্য, বুদ্ধ, মহম্মদ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ শঙ্করাচার্যের এঁনাদেরও নয়। তবে কার? এ দর্শন তাঁর যিনি রূপে মজেছেন, যিনি সেই রূপবান অরূপকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন সবকিছুর মধ্যে। এ তাঁর, সেই সরল সাধারণ কালো-কুলো, গেরুয়া আলখাল্লা পরা আর নিজের হাতে বানানো যন্ত্রটা হাতে নিয়ে হাঠে-মাঠে-ঘাটে, ট্রেনে বাসে নৌকোয় ঘুরে ফিরে বেড়ানো সেই মানুষটার। ভরা বর্ষায় অজয় দেখেছো? দেখেছো কি চোখের পলকে অস্তবেলার সূর্যকে ঘিরে থাকা একটু হলদেটে মেঘের ইট রঙা হয়ে যাওয়া? না দেখে থাকলে, দেখো। সুযোগ না থাকলে সুযোগ করে দেখো। এদের যদি দেখে থাকো, তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করবে কেন, সুন্দর কাকে বলে? কোন বইতে আছে বলে শুনিনি, সুন্দর কথাটার মানে। যা লেখা আছে, তা একটা ধারণা দেওয়া—কথাটার বাইরের আকারটাকে ছোঁয়া। কিন্তু, মানে, অর্থ? না, এর

কোন মানে কেউ দেন নি। তাই বলে, সুন্দর ব্যক্তিবিশেষে আলাদা হয় না। সুন্দর, সুন্দরই। সে চিরসুন্দর, সে বিশ্বরূপ, সে চিরন্তন। এই হচ্ছে সে মানুষটার বোঝা। আবার, ফিচেল আমি-র বদমাইসি; তবে কালো মেয়ে ছেড়ে লোকে ফর্সা মেয়ে খোঁজে কেন বিয়ের সময়? কঠিন প্রশ্ন, অতএব সাধারণ লোকটি নিশ্চয়ই থতমত খাবে উত্তর দিতে কিংবা সদুত্তর দিতে পারবে না। কিন্তু, অবাক, অবাক। আমার শিক্ষার গর্বও এঁর জ্ঞানের কাছে ধূলিসাৎ নিমেষে। তুই যাকে কালো দেখিস, তাকে অন্যে ফর্সা দেখে বলে। যখন তুই মানুষের গায়ের রংটুকু দেখিস, তখন আসলে দেখিস শরীর। তাই তোর কামনার দরজায় দুরকম অনুভূতি হয়। আর যে শরীরের আবরণ ভেদ করে মনের গভীরে ডুব দিতে পারে, তার মনে ফুটে ওঠে সাতটা রং—একসাথে, এক অনুপাতে। তা-ই সাদা। তুই মনের রং দেখতে পাস না বলে তোর চোখে সাতটা রংয়ের কোনটারই অনুভূতি নেই। তাই কালো। ফিচেলের ফিচলেমি যায় না। শিক্ষার গর্বে বোধ হয় আঘাত লেগেছে। তাই আবার সদম্ভ জিজ্ঞাসা: তাহলে তো ভালো-খারাপ বলে আলাদা কিছুই নেই। সবই ভালো, তাহলে তো ন্যায় ও ভালো; অন্যায় ও ভালো, পাপও ভালো, পুণ্যও ভালো, বড় ধোঁয়াটে ছিল সেই উত্তরটা, কিন্তু এখনও মনে লেগে আছে, কারণ সেই কথাতেই আমার ক্ষান্তি, হ্যাঁ শান্তিও। আমার মতো কথা-বলতে পারা আজকের লোকটা তখন কিন্তু মুখচোরা থাকলে কি হবে, তার তেজ ছিল, জেদ ছিল, সে হার মানতে লজ্জা পেতো. পিছন দরজা দিয়ে নয়, সামনের দরজা দিয়ে কোন শক্তিশালীকে হারানোর মধ্যে এক অনন্য গর্ব, অনন্য তৃপ্তি বোধ করত, তবু আমি হার মেনে নিয়েছিলাম। কিছু জায়গায় হার মানতে হয় কিছু জায়গায় ইচ্ছে করে হার মেনেও আনন্দ হয়। প্রকৃত বীরের কাছে হার স্বীকারের মধ্যে কোন লজ্জা আমি পাই না। হ্যাঁ, এতক্ষণে নিশ্চয়ই ছটফট্ করছ। কি ছিল সেই উত্তরটা যা কিনা আমাকে পর্য্যন্ত থাবড়া মেরে বসিয়ে দিতে পেয়েছিল, আবার পেরেছিল তার শ্রদ্ধা কেড়ে নিতে।

আমি আমাকে দিয়েই তোমাকে বুঝি, আবার তোমাকে খুঁজি। না, অনেক দুষ্টুমি করেছি। সেই বীরভূমের লাল মাটি ভেঙে আসা, কোপাইয়ের ধারের উঁচু-নীচু পাথর টপকে আসা হাঁটুর উপর হাতটা রেখে সে কি বলল জান? বলল, তুমি ঠিকই বলেছ। পৃথিবীতে ভালো বলে কিছুই নেই। খারাপ বলেও আলাদাভাবে কিছু নেই। ভালো তখনই বলবে কাউকে, যদি আর কাউকে

তুমি খারাপ ভাবে জান। আর, এসব ভালো-খারাপের বোধই যদি তোমার না থাকে, তাহাহলে সবই নিরাকার, নির্গুণ। সেই বোধের স্তরে পৌঁছতে পারবে? পারলে দেখো, কোপাইয়ের পাড় আর অনেক দূরের ঐ আকাশটার মধ্যে কোন তফাৎ পাবে না। এ বড় কঠিন জিনিষ, বড় আপন করে পাওয়ার জিনিষ। তবু, তোমাকে বলি, আর কাউকে এই ঘটনাটা, এই অনুভূতিটা আমি গল্প করিনি। করিনি, কেননা সবাইকে এই ভালো লাগাটা যাবে না। আচ্ছা বল, তুমি ছাড়া আমার এই পাগলের বক্-বকানি আর কেউ শুনবে? তুমি পাগল, তাই আমার মত পাগলকে বোঝ, আমার কথা শোন, আমাকে আদর কর, আমার চোখের জল মোছ, আমার মাথাটা পরম সোহাগে, পরম ভালোলাগায় কোলে তুলে নাও। আচ্ছা, এ-ও বোধহয় আমার আর এক পাগলামি। ছিল তো এতদিন মনে মনে। আজ কেন তোমায় বলি? কেন বলতে চাই? শুনতে চাও বলেই কি বলতে চাই, না, বলতে চাই বলে শুনতে চাও? কে আগে? কি আগে? এ সেই, কে প্রথম ভালো বেসেছি, কে প্রথম চেয়ে দেখেছি: তুমি, না আমি? কিংবা, সাপ ব্যাঙ খায় বলেই ব্যাঙ দেখে এগোয়, না, ব্যাঙ সাপের খাবার হয়ে যেতে পারে বলে সাপ দেখলে পালায়? বড় কূট কচাল। সবের উত্তর আমার তো জানা নেই। তবে একটা গোপন কথা বলি, যখন এমন দ্বৈত প্রশ্নের উত্তর পাই না তখনই মনে পড়ে একতারা হাতে সেই মানুষটির কথা, যে কিন্তু বলেছিল তাঁর সাথে আমার দেখা হবেই – আমি তাঁর খুঁজে বেড়ানো পাগল মানুষ। তিনি যখন পাগল বলেন, তখন আমি চির পাগল আর তুমি যখন পাগল বল, 'ধন্য যে হয় সে পাগলামি'। তবে কি এই দুই পাগলামি আলাদা? আবার সেই কালো কুলো লোকটি যে 'সাধের লাউ' হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, মনের সুর তারে তোলে। আমার কাছে এখন এ দুই পাগলামি এক—খোঁজা, খোঁজা রূপ খোঁজা, অরূপ খোঁজা। মিষ্টির রূপ কি? আমি যে রূপে দেখব সেই তার রূপ। সে যে রূপে দেখা দেবে, তাই তার রূপ। এই দুই রূপে যখন কায়া আর ছায়া আলাদা থাকবে না—বিজ্ঞানের ভাষায় কোন parallaxও থাকবে না, তখন আমার খোঁজা সার্থক। অনেক অনেকদিন চলে গেছে, বাস্তবে সেই মানুষটির সাথে আমার আর দেখা হয়নি, কিংবা হয়তো মেলার ভীড়ে আমার চোখ এড়িয়ে গেছে সেই চাহনি, সেই দৃষ্টি, কিংবা হয়তো মনে গভীর রূপ গাঁথতে পারিনি। কিংবা হয়তো সময়ের বিবর্তনে প্রায় ত্রিশ বছর আগের চেহারা দু জনেরই অনেক অনেক বদলে গেছে। তাই হয়তো দেখা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু যে কথাটা বলব

বলে বলতে গিয়েও অভ্যাস বশে ঠেকে গেলাম, এক রাগ বলে অন্য রাগে গাইলাম সেটা এবার বলি। আচ্ছা, তুমি হরিদ্বারে গেছ? সেখানে ব্রহ্মকুণ্ডে সদ্য পাহাড় ভেঙে নেমে আসা স্ফটিক জলে গঙ্গার সত্যিই পতিদেবটির জটা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার মতো অবস্থা, অথবা নিম্নবাহে অজস্র সন্তান সন্ততিকে প্রতিপালন করার দুশ্চিন্তায় পরবর্তী জন্ম দিতে গিয়ে গর্ভস্রাবের অবস্থা। সেখানে চান করতে গেলে শিকল ধরে, শিকলের আওতায় থেকে চান করতে হয়। সন্ধ্যে বেলায় আর এক রূপ, কংক্রীট দিয়ে আটকানো অন্যদিকের শান্ত গঙ্গায় অজস্র প্রদীপ ভাসায় মঙ্গলকামী মানুষ। মুক্তিকামী বলব না, কারণ মুক্তিকামী মানুষ কোন অনুষ্ঠানের ধার ধারে না। সেখানে সূর্যপার করা প্রথম আঁধারে এক আসন্ন গর্ভবতী মহিলাকে দেখেছিলাম, একা একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে কোন রকমে নীচু হয়ে গঙ্গার বুকে ছেড়ে দিলেন। নীচু হতেও কষ্ট; কষ্ট সোজা হতেও। সোজা হয়ে যুক্তকরে গভীর প্রণাম। দেহতি কায়দায় শাড়ী পরা, দেহাতি কায়দায় ঘোমটা নামানো। হাতে ধরা এবং চুঁইয়ে পড়ে কম হয়ে যাওয়া গঙ্গাজলটুকুই ছেটালেন নিজের মাথায়, আর আকাশের দিকে। কয়েক মিনিট, মাত্র কয়েক মিনিট। কাতর যন্ত্রণায় বসে পড়ে গোঙাতে লাগলেন কয়েক মুহূর্ত পরে শুয়েও পড়লেন। আশে পাশের কিছু লোকের চীৎকারে অন্যান্যরা ছুটে এলেন, অভিজ্ঞরা বুঝলেন, পরে আমি জিজ্ঞেস করে বুঝলাম, সন্তানের জন্মদান নিকটবর্তী। অনেক ধরাধরি করে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন উপরের ডাক্তারখানায়। একঝলক আলো পড়া মুখে দেখেছিলাম কষ্টের ছাপ। সিঁথি দেখেছিলাম, সাদা একটা কালো ছবি। এই-ই আমার সেই বাউল ঠাকুর, অন্ততঃ তখন তাঁর মুখের আদলটা ফুটে উঠেছিল আমার মনে। 'সন্ধ্যা হলে জ্বলন্ত প্রদীপখানি ভাসাইয়া জলে, শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে চাহি একমনা, করিবে সে আপনার সৌভাগ্য গণনা একাকী দাঁড়ায়ে ঘাটে'। আবার 'জন্ম লব তব গেহে, তব পুত্র কন্যার মাঝারে'। এই-ই কষ্ট, এই-ই আনন্দ, এই-ই শঙ্কা, আবার এই-ই সহ্য করা। এই-ই বেদনা আবার এই-ই সূচনা, এই ই নিঃশেষ, আবার এই-ই অশেষ। এই দেখাই আমার সেই ছোটবেলায় দেখা লোকটি। সে এক রূপ, তুমি এক রূপ, একই সত্তার দুই রূপ, তাই তো তোমার রূপের মাধুর্যে নিজেকে সঁপে দিলাম, হল দুই পাগলের পাগলামি। ফাজিল, বদমাইস, দুষ্টু, Prince, intelligent কিন্তু, তবুও কাম্য। এতো গেল, আমায় বিশেষণগুলো—তোমার কাছে। আর তোমার বিশেষণ? বিচ্ছু বিচ্ছু না —

অধ্যায়—৩

খুব ক্লান্ত লাগছে তো ? লাগুক, তুমিও তো পাগল, আবার কখনও কখনও পাগলের ডাক্তারও। বকতে যখন বসেছি বকেই যাব, যাকে শোনাতে বসেছি তাকে বলে তো গেলাম। আমি তো বদমাইস, শুনব না বললে শুনব নাকি ? শোনাবই, বরং বলি, শোন আর না-ই শোন, বলেই যাই। তাই-ই ভাল। আমি তাই গান গাই। আমি পুরুষ কোকিল না ? তুমি মেয়ে কোকিল। তোমার শোনা কাজ আর শুনে বুক ফুলিয়ে ওম নিয়ে বুক ভরে প্রকৃতি থেকে শ্বাস নিয়ে মাঝে মাঝে কুহু কুহু করে উত্তর দিয়ে যাও। আর যদি কখনও আমার ডাক থেমে যায় ? চিরতরে ? তাহলে ঠুকরে ঠুকরে অন্যতানে ডেকে যেও—সে ডাক আকুলতার। সে ডাকে আমাতে জীবনীশক্তি এনে দিও—সে আমার মৃত-সঞ্জীবনী। সাবিত্রী সত্যি সত্যিই যমরাজের কাছ থেকে সত্যবানকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলন কি-না, এ বিচারে আমাদের কাজ নেই, কাজ নেই ভালো-বাসার থেমে থাকায়। সত্যি হোক আর না-ই হোক, সত্যবানের জন্যে সাবিত্রীর ডাক, লখীন্দরের জন্যে বেহুলার কৃচ্ছ্রসাধন এ চিরন্তন সত্য—অন্ততঃ আমাদের কাছে, ভারতবাসীর কাছে। এর মাধুর্য যেদিন মানুষের মন থেকে হারিয়ে যাবে, সেদিন মূল্যবোধ বদলাবে, সাহিত্য নতুন রূপে লেখা হবে। সব কিছুর অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা থাকলেও বস্তুত দ্বৈতবাদ বেঁচে থাকলেও, কিছু থাক ব্যাখ্যার অতীত। তা শুধু বিশ্বাস হয়ে বেঁচে থাকুক—ভবিষ্যত মানবতার কাছে আমার এটুকুই কামনা। এ সত্য হারিয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই না, চাইনা আমার বিশ্বাস খুঁজতে যেতে, আর খুঁজতে খুঁজতে হারিয়ে যেতে।

পৃথিবী রূপে সজীব হয়ে থাকুক, একে ধূসর দেখতে আমার কষ্ট হয়। তবু, মেনে নিতেই হয়। ঋতু একাধিক—তাদের নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর পরিবর্তন আছে। তাই ছ'টি ঋতুর কোনটি না এলে, অর্থাৎ ঠিক সময়ে না এলে, কোনটি বিলম্বিত হলে আর কোনটি দীর্ঘস্থায়ী হলে মন কেমন করে ওঠে। পাতা ঝরতে ঝরতে গাছ ফাঁকা না হলেও ভালো লাগে না, নতুন পাতা গাছের গা বেয়ে, গাছকে অবলম্বন করে না জন্মালেও ভালো লাগে না। যা স্বাভাবিক তাই কাম্য। তবু পারলাম কই স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠতে ? স্বাভাবিকই যদি হব, তবে মেয়ে কোকিলটার ডাক ঠিক সময়ে, ঠিক ক্ষণে কানে না এলে মনটা আন-চান করে ওঠে কেন ? কেনই বা, আচার-আচরণে, চলনে-বলনে অস্থিরতা ফুটে ওঠে ? তবে কি এটাই স্বাভাবিক ? এ-ও জানি না ; তোমার ভাষায়, তা-তো

জানি না। জানি না, জানি না। অনেক কিছুই জানি না। যাক না। সব কিছু জেনে দরকার কি? আমি তো 'বুদ্ধ' নই, নির্বাণ লাভও আমার কাম্য নয়। তাই যা পাই, তাতেই ভরে থাকা ভালো। জন্মান্তর শক্তির রাসায়নিক ব্যাখ্যায় মেনে নেওয়া ভাল, কর্মফলের ব্যাখ্যায় তাকে মানতে বা ব্যাখ্যা করে সান্ত্বনা পেতে চাই না। এস, বিশ্বরূপ খুঁজে সার্থক হই, বিশ্বরূপের মধ্যে নিজেকে লীন দেখে নিজেকে, সব কাজকে ক্ষুদ্র ভাবতে শিখি। বোধহয়, তাতেই শান্তি। না-কি এ-ও শুধুই সান্ত্বনা? জানি-না। না-এর দিকের পাল্লা আর একটু ভারী হল, নীচের দিকে তা ঝুঁকে পড়ল। কিছুতেই হ্যাঁকে বেশী করা যাচ্ছে না, এমন কি সমানও নয়, তবে, থাক্‌গে যাক্‌। পাততাড়ি গুটোই। কিন্তু যাই বা কোথায়? তাঁর ডাক না এলে তো যেতে পারি না। আমার চাওয়ার উপর নির্ভর করে তো তাঁর ডাক আসে না। হীন, বড় হীন আমি। না, এ-ও আমার কাম্য নয়। হীনমন্যতায় ভুগে সেই বিশ্বরূপের থেকে সরে যেতে আমার ভালো লাগে না। নাকি, নিজেকে হীন বলে ভাবতে পারলে তবেই আমার বিশ্বরূপকে অচ্ছেদ্য ভাবে পাব? এই দ্বৈতবাদ ও আমার সমাধানের ক্ষমতার বাইরে। তবে থাক, শুধুই দেখে যাই, উপলব্ধি করে যাই, কোন এক পরম সত্যকে আমার রোমকূপে, আমার শোণিতের লোহিত কণিকায়, আমার মজ্জায়, আমার হৃৎপিণ্ডে। শুধু যা কিছু রাখতে চাই না, তা ফেলে দিতে পারার জন্যে আমার রেচনযন্ত্রটা সক্রিয় থাক। আর, জনন ক্ষমতা? সে-যাক, যদি আমার জননেন্দ্রিয়ের কাজে কোন সার্থক জনন সম্ভব হয়। সার্থক জননটা কি? অর্থ উপার্জন করা, বিদ্যা অর্জন করা—এরকম কতকগুলো গুণ আয়ত্ত করা? কে কাকে গুণ বলে, আর কে কাকে দোষ বলে জানি না। তবে আমার দেওয়া জন্ম যেন কিছু না হলেও একটা মূল্যবোধ আয়ত্ত করতে পারে তা হল মানবতা—নিজের ক্ষমতার পরিধির মধ্যে থেকে সেই গুণটিকে নাড়িয়ে-চাড়িয়ে দেখা। আর, আর একটা কামনাও করি। সে যেন ভালোবাসতে শেখে।

আবার সেই চাওয়া? আবার সেই আমি? আবার সেই কামনা, সেই অধিকার বোধ? ঘুরে ফিরে এসে যায়, তাই হয়তো আমি পূর্ণতা পেলাম না। এ-ই আমার সীমাবদ্ধতা, এই আমার মানুষ রূপ—ঐশ্বরিক নয়, কাল্পনিক নয়।

যদি কোনদিন তোমার যদি কোনদিন তোমার আগে আমাকে চলে যেতে হয় তোমার ভালবাসা-র মায়া কাটিয়ে দূরের আকাশে তারা হয়ে, ভোরের

শুকতারার আর সাঁঝের সন্ধ্যাতারা হয়ে কিংবা উত্তরের ধ্রুবতারার মধ্যে বা সপ্তর্ষিমণ্ডলের একটা ঋষির বুকে কিংবা কালপুরুষের কোমরবন্ধনীতে বা লুব্ধকের চোখের মণিতে তা হলে সেদিন কেঁদো, সবার সামনেই বুক ভাসিয়ে কেঁদো— আর লেখাগুলোকে আমৃত্যু বুকে আগলে রেখো। লেখা শুরু করেছিলাম নেশায়, চালিয়ে গেলাম তোমার নেশায়। এ-ঘোর যেন না কাটে, আমার বলা বা না বলা সব কথাই বিভিন্ন রংয়ের কালিতে রঙীন হয়ে থাকুক তোমার মনে, তোমার কাছে। আমি এখন সবার জন্যে লিখি না, লিখি তোমার জন্যে, তবে মজা লাগে ছাপার আকারে শোনাতে। ছাপার অক্ষর ছন্দ হয়ে নেচে বেড়াক—সবার সবার চোখের সামনে—কিন্তু যে বুঝল, যে বুঝতে চাইল, মন দিয়ে শুনতে চাইল, শুধু তার জন্যে, তারই জন্যে।

আর, আর যেদিন আমার হাত কাঁপবে, কিংবা চোখের মণি অস্বচ্ছ হয়ে যাবে কিংবা কোন উত্তেজনা ছাড়াই বুকের ছটফটানি তাল ও লয় ভুল করে ই-সি-জি-র গ্র্যাফকে কখনো অনেক উঁচু বা অনেক নীচু দেখাবে সেদিন আমি তো আর লিখতে পারবো না। মনে মনে গুমরে ওঠা কথাগুলো বকম্ বকম্ করে শুধুই তোমর কানে শোনাতে চাইব, দু-লাইন লিখে তোমাকে অঞ্জলি দেবার কিছুই আমার সেদিন থাকবে না। অস্বচ্ছ দৃষ্টি তোমাকে হয়তো বহিরঙ্গে পাবে না, দেখতে পাবে না সদ্য পাড়া বুকের নরম ডিম দুটোকে, দেখতে পাবে না আবরণ করে রাখা এবং আবার মেলে ধরা গোপন রূপকে—যা দেখে দেখেও চিরনূতন রাখার সাধনাই মানুষ করে চলে, সেদিন বড়, বড় কষ্ট হবে আমার। তোমাকে দেখতে না পেলে এখন যতটা কষ্ট হয়, তার থেকে কম কি বেশী জানি না, তবে ভাবলে বুঝি সে বড় কষ্ট কষ্টের দিন। তবু তোমাকে ছুঁয়োর মত, তোমার গায়ের সুগন্ধ মেশানো অথবা ঘর্মক্লান্ত ঘ্রাণ বুকভরে নেওয়ার মতো সজীবতা সেদিনও যেন আমর থাকে, এই আমার কামনা। তখন তোমাকে কেন্দ্র করে অমার বুক শুধু গুমরে গুমরে কাঁদবে। তাকে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশী শুনেছি। সেদিন তোমার সাথে সাথে আমার একগুচ্ছ লেখাও আমাকে ছুঁয়ে দেখতে দিও, পারলে অবসর মত ভালবেসে একটু একটু করে পড়ে শুনিও। আমার শেষযাত্রার সেদিনগুলোয় নরম ফুলের পাপড়ি না হোক, নরম একটা কার্পেট বিছিয়ে দিও। আমি ঘুমোব, পরম তৃপ্তিতে—ব্যথা সহ্য করা প্রশান্তিতে।

প্রলাপ বকলাম না—আলাপ করলাম কি জানি। কেঁদেও শোনাই, শুনেও কাঁদি। একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। মাথা আর লেজ আলাদা করে ভাবুক,

প্রতিযোগীরা। আমি সোজা-সাপটা ভাবতে ভালবাসি। তাই হেড-ও যা টেল ও তাই। মূলমান। আর তা-ই তো আসল। তুমি সেদিন আমায় বলেছিলে, আমি বুঝি, তুমি অনেক কিছু ভেবে বসে আছ। হ্যাঁ গো মেয়ে, ভাবি। নির্দ্দিষ্ট কিছু লক্ষ্যের চিন্তা নয়, চিন্তা সাত পাঁচ। ভাবাই তো আমার বিধিলিপি। তা আমি খণ্ডাই কেমনে? ভাবি বাস্তব, ভাবি অবাস্তব, ভাবি সত্য, কল্পনা করি স্বপ্ন। কায়া কি ছায়া, বস্তু কি প্রতিফলন এ ভেবে দেখি না। শুধু-ই ভাবি। আর কলম আর কাগজ পেলে লিখি, লিখে যাই, দেওয়ার জন্যে, শোনানোর জন্যে। শুনলে আমার ভাবনা সার্থক, পড়লে আমার লেখা তৃপ্ত।

আপাততঃ কাগজ শেষ। তাই লেখাও অসম্পূর্ণ। অবশ্য তা চিরকালই। কোন সুন্দর কাব্যের বোধ হয় পরিণতি বলে কিছু থাকে না। অবশ্য পরিণতি না বলে একে সমাপ্তি বলাই ভালো। আমার কাব্যও যেন সেই অসমাপ্তির মধ্যেই সৌন্দর্য্য পেতে পারে, নিজে রেঙে তোমায় রাঙাতে পারে, সে দিন কি সত্যই রূপ হয়ে ধরা থাকবে? তবে দিন না পেলেও, যা পেয়েছি, তা আমার কাছে শুধু কাব্য নয়, মহাকাব্যের উপাদান। শুধু লেখনী বা মনের অনুঘটক দিয়ে জোড়ার কাজটা সারতে পারলেই রূপে লক্ষ্মীগুণেসরস্বতী হয়ে ফুটে উঠবে—প্রেক্ষাপটে প্রতীক্ষারতা কন্যা, প্রদীপ হাতে রাতে আমার অভিসারিকা।

অধ্যায়—৪

আজ আমার কথার থেকে, আমার চাওয়ার থেকে অন্যদের বোঝানোই বড় হয়ে গেল। অনেক কিছুই বলব বলে ভাবি। কিন্তু নির্দয় সময় তা' হতে দেয় না। পৃথিবীতে গ্রীণউইচের মাপকাঠিতে বিভিন্ন অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশের উপর সূর্যের উপস্থিতির ভিত্তিতে আমরাই আমাদের সময় ঠিক করে নিয়েছি। আর সূর্যের উপস্থিতি, আমাদের আবর্তন যে কে বেঁধে দিয়েছে, তা আমরা জানিনা। শুধু উপলব্ধি করি, আমরা বড়ই বাঁধা। কিন্তু ওকে যে আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। নিজেদের বাঁধন ছিঁড়তে চাইলেও পারা যায় না। তবু সবার উপরে মন। তাই বলা শুরু করলে, এমন কি নীরব সাহচর্যের সময়ও ঘড়ির কাঁটা একটু দ্রুত লয়েই নাচে। অন্ততঃ সে ধারণাই বদ্ধমূল হয়। চাওয়ার সাথে পাওয়ার দুস্তর ব্যবধান তৈরী হয়।

সূত্র অসংলগ্ন হয়ে যায়। কিসের পর যে কাকে বসাই, কাকে সাজাই! এতো মালা গাঁথা নয় যে ফুলের রং অনুযায়ী সুতো নির্বাচন করব, কার পরে

কাকে আনব ঠিক করব। আগে থেকে ঠিক করে কাজ করা হয়নি, যে আজ কোন নিয়মের জালে তাকে বাঁধতে চেষ্টা করব। তাই মালা পরাতে পারি না, সব ফুল এক জায়গায় করে দুহাত ভরে শুধু নিবেদন করি। তাকে তুমি অঞ্জলিই বল, আর সমপর্ণই বল। যা দিলাম তা আমার। নেওয়ার ভার বল আর দায় বলো তা তোমার। তবে যদি ফিরিয়ে দাও? তখন, ফুল কার হবে? সে কি আবার আমার হবে, না কি অরক্ষণীয়া বলে তাকে ধরা হবে? দিয়ে দেওয়া হবে বলেই তো দেওয়া। ফেরৎ তো তাকে নিতে পারা যায় না। উত্তর তিরিশে মানুষের পাওয়ার থেকে এবং না পাওয়ার থেকে পেয়ে হারানোর বেদনাই বেশী হয়ে ওঠে। তাই হারাতে গেলেই বেদনা। অনেক পেয়েছি তাই হারানোর ভয়ও অনেক. হারিয়ে গেলে বেদনাও আয়তনে আকাশ ছুঁয়ে যাবে। সেই বেদনা আমাকে কতদূরে পৌঁছে দেবে তা তো জানি না। ধান ভানতে শিবের গাজন। সাত রাত তেল পুড়ল, কেন না, রাধা নাচবে। কিন্তু মুরলীধারী তো এখন বেণুবনে। যদিও বংশী ধ্বনি থামে না। অনেক ইথার তরঙ্গ পার হয়ে সে মুরলীর ডাক পৌঁছে যায় রাধার কানে। মন আকুল হয় রাধার। পেছন থেকে ডাক আসে শৃঙ্খলার, যমুনার ধারে না যাওয়ার জন্যে। অভিসার বন্ধ রাখার জন্যে সবার কি আকুতি, ফিরে আসার জন্যে শেষ পর্য্যন্ত মিনতি। এখন রাধা কি করবে? তুলোর চল হয়নি। অতএব দোটানায় পড়ে কানে আঙ্গুল। কিন্তু এতো সাধারণ শব্দ তরঙ্গ নয়। তাই ফাঁক ফোঁকর খুঁজে কর্নপটহে ধাক্কা পড়ে। আর আরও বড় ধাক্কা পড়ে মনে। কি করে যে এমনটা হয়। মন তো কোন বস্তু নয়. তাই স্বাভাবিক জীব রসায়ন বা জীব পদার্থ বিদ্যা মানে না। কোথা দিয়ে সে যে ঢুকে পড়ে, সমস্ত স্নায়ুতন্ত্র বিকল করে দেয় এ কেউ বুঝতে পারে না। কেমন করে শুরু তা জানা নেই। প্রায় কর্কটরোগ। শুরুতে বোঝা যায় না, যখন বোঝা গেল, তখন শেষও এগিয়ে এসেছে। শেষ কোথায়? মরণে, নির্বাণে না কি মোক্ষে? না, না, এসব মহাপুরুষদের জন্যে। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপত্রটা আলাদা। শেষের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। শুধু শেষটা যেন বিরহে না হয়ে হয় মিলনে। আরে এ তো চাওয়া। ওষুধ খেলেই কি সব সময় ঠিক ঠিক কাজ দেয়? তবে কাজ দেবে কি দেবে না এ ভেবে তো ওষুধ খাওয়া শুরু হয় না শুরু হয় আশা করে। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া তো থাকবেই। সেরে ওঠার কামনাও চিরন্তন। মানুষ যখন মরতে চায় বা সারতে না চায়, সে বড় দুঃখের সময়। তাই রাধিকাও উচিত কাজটাই করে। জ্বালা জুড়োতে হবে। তবেই কি না অসুখ সারবে। কুলে

কালি দিয়েও রাধিকা তাই এগোল যমুনার দিকে। সেখানে যে শ্যামসুন্দর প্রতীক্ষা করছে। বড় লজ্জা! সবার চোখের সামনে দিয়ে ওঁর কাছে পৌঁছোনো! কি করা যাবে। এদিক ও দিক ভাবতে ভাবতে শ্যামের টানে রাধা ভাসে। ভেসে চলে। কূলের দিকে, না কি অকূলের দিকে? মনে হয় শেষেরটাই। লক্ষ্য যদিও কূলে পৌঁছানো। একূল থেকে ওকূলে। কিন্তু ভাসতে গেলেও সাহস সঞ্চয় করতে হয়। ভাসার আগেই যত দোটানা। ভেসে পড়লে আর কিছু নেই। তখন অকূল গাঙে শুধুই ভাসা! ফলের আশা ছেড়েই। কার টান বেশী? এ কূলের না ও কূলের?

অধ্যায়—৫

কেমন আছো? নিশ্চয়ই খারাপ। শরীরের দিক থেকে। অবশ্য এ-ও তো সেই, ইংরেজীতে যাকে বলে vicious cycle, আর বাংলায় কিহ বে? বৈয়াকরণিকের ছন্দে না হোক, দার্শনিকের গাম্ভীর্যে, জটিল আবর্ত। শরীর খারাপ হলে মন খারাপ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। তাই, শরীর বা মন যেটাই তোমার খারাপ হয়ে থাকুক না কেন, আসলে খারাপ দুটোই। আবার এও সেই জটিল আবর্তেরই অঙ্গ। যে মিলনে বলপ্রয়োগ থাকে না, কিন্তু দুজনেরও পূর্ণ চাওয়া এক লয়ে গেয়ে ওঠে না—তা ভোগ। যে মিলনে বলপ্রয়োগ থাকে, তা ধর্ষণ; আর যে মিলনে কামনা-বাসনার চারদেওয়ালের গণ্ডী ছাড়িয়ে থাকে এক আত্যন্তর তৃপ্তি—তা সম্ভোগ। সম্ভোগ মিলনের পরিপূর্ণ রূপ। এ রূপ ব্যসনের, আশ্লেষের, আভোগের, বিবশতার। আর এক মতে, নেশা করার আনন্দ নাকি বিবশতার মাধুর্যে ঘুমিয়ে পড়ে নয়। সহ্য করতে না পেরে উগরে ফেলেও নয়। আমি অবশ্য পান করে কখনও সেই বিবশতার স্বাদ পেতে পারি নি। কি জানি, হয়তো মন প্রস্তুত ছিল না, অথবা অপাত্রে পড়েছিল, তাই মাধুর্য্য পাত্রস্থ বা সুপাত্রস্থ হয় নি। সে যাই হোক, জীবনের মধ্যাহ্নে (না কি অপরাহ্নে) এসে সেই বিবশতার স্বাদ পেলাম, একটু অন্যরকম পরিপ্রেক্ষিতে। সুরাপানে নয়। কথা বলে, সান্নিধ্যের উষ্ণতার ছোঁয়ায় অঙ্গের সাথে অঙ্গের মিলনের আকুতিতে, একটু ছোঁয়ার আকাঙ্ক্ষায় ও স্পর্শে। মুক্ত বেণী বিবসনে, /বিকশিত বিশ্ববাসনার/অরবিন্দ মাঝখানে,/পাদপদ্ম রেখেছো তোমার/ অতি লঘুভার। আবার সেই বি ব শ. বি-ব-স···'শ' বদলে 'স'। অর্থ-ও গেল বদলে। তবুও বিবসনে সুখ দেয়, বিবশতা নয়। সব সময় অবশ্য বিবসনেও যে চিরমধুর তা', নয়। মাধুর্য এতে, আবার ও-তে ও, আবার তাতে ও। অর্থাৎ কিনা, বেশে. বিবাবেশে, আবার অর্ধবেশে। সব কিছুর

উপর আমার নিয়ন্ত্রণ নেই। কিংবা, নিয়ন্ত্রণবিহীন, শৃঙ্খলাহীন এই ট্র্যাকের বাইরে গিয়ে, ইচ্ছে করে প্রতিযোগিতা থেকে পিছিয়ে গিয়ে, হেরোদের মধ্যে প্রথম হওয়ার আনন্দই বোধহয় ভোগ করার সুষম আকাঙ্খা। তা-ই ভাল, জিতে হারা ভাল নয়, এবার বরং হেরে জিতি। জিততে দেবে তো শেষ পর্যন্ত? আরে ফরোয়ার্ড লাইনে যতই খেলি না কেন, গোলকিপারকে না হারানো পর্যন্ত তো গোল হবে না। নিজের গোল নিজে রক্ষা করছ। যদি গোল খাওয়ার সাধ কর একমাত্র তবেই গোল করতে পারবো। অনেকটা ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যুর মত। অতএব, গোলের মুখে এসে অনেকদিনের চেনা গোলকিপারকে দেখে থতমত খেলে, তখন কিন্তু ইঙ্গিত দিতে হবে। তখনই বুঝব, জাঁদরেল গোলরক্ষকটি এবার প্রস্তুত, গোল খেতে। তখনই, ছোট্ট পাশ আর গোলদাতার মেদিনীচুম্বন। তবে, গরবের জায়গাটি নেই। গোল দেওয়ার ইঙ্গিত না পেলে, পা কেঁপে উঠবে দোনা মোনায়, পারব কি পারব-না, এই দোটানায়। লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারি। অতএব, হে বৃক্ষোপরি উপবেশিত পাখীটি, ইঙ্গিত কর, অভয় দাও, শরবিদ্ধ করি। তুমি যে দ্রোণাচার্যের পরীক্ষামূলক পাখি। আশীর্বাদ না থাকলে অর্জুন পারতেন না, সস্নেহ প্রশয় না থাকলে অর্জুনকে হার মানতে হতো, কূটচালে একলব্যের দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্টটি আদায় না করলে, আজ ভারতবাসীর চোখে অর্জুন নায়ক হতে পারতেন না, হতেন একলব্য। অঙ্কুরেই বিনাশ পেতেন গাণ্ডীবের অধিপতি, কৃষ্ণ-সখাটি। প্রশ্রয় দরকার, দরকার সাহায্য, দরকার পক্ষপাতিত্ব। অপ্রভাবিত কোন রণে কে জিততেন — রাম না রাবণ? অর্জুন না একলব্য? অর্জুন, না চির অন্ধকারে থাকা কুন্তী গর্ভজাত, সূর্যপুত্র কর্ণ? প্রতিক্ষেত্রেই বোধহয় শেষের জন—কারণ প্রকৃতবীর তাঁরাই। তবু, পাশার দান উল্টোয়। বিধাতার খাতাতেও পক্ষপাতিত্ব শব্দটি বহুল প্রচলিত। তাই রাম জেতেন, অর্জুন জেতেন। আর হারের কলঙ্ক মাথায় নিয়েও কিন্তু প্রকৃত যোদ্ধার কাছ থেকে বীরের সম্মান পান রাবণ, একলব্য, কর্ণ। রথের চাকা মাটিতে না গেঁথে গেলে, ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ কুণ্ডল হস্তগত না করলে, কৃষ্ণের কূটবুদ্ধিতে শিখণ্ডী সামনে না দাঁড়ালে, ভীষ্মের হাতের থেকে বেরিয়ে আসা। দারুণ মৃত্যুবাণ নিজের প্রজ্জলিত তেজে আটকে না দিলেও মহাভারত রচিত হত— শুধু নায়ক বদলে যেত। যাই হোক, যা বলছিলাম, জিতিয়ে না দিলে জেতা যায় না, ধর্ষণ করা যায়। মোটামুটিভাবে হয়তো ভোগ করা যায়, করা যায় না সম্ভোগ। তার জন্যে চাই, একের অগ্রসর, অন্যের সমর্পণ — কিংবা, দুয়েরই এক মিলিত বিন্দুতে সমন্বয়।

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। আমিও বোধ হয় তা-ই। সেজন্যেই কথা বলতে যাই, আর লিখেই যাই, বক বক করি। তবে ধান ভানতে ঢেঁকি-ই হোক, আর আধুনিক হাস্কিং মিল-ই হোক, একটা যন্ত্র দরকার। তেমনি, বক বক করতে গেলেও শোনার লোক দরকার, বুকে টানতে গেলে গ্রহণ করার মত একটা বুক দরকার, ঠোঁটে ঠেঁ নামাতে গেলে মাপে মাপে মেলা দরকার, উত্তল লেন্সকে শক্তিশূন্য করতে গেলে বিপরীত মাপের অবতল লেন্স দরকার, উত্তর মেরু প্রশমিত করতে দরকার সমপরিমাণের দক্ষিণ মেরু, আবেগ উপভোগ করতে গেলে দরকার আবেগ সমভাবে উপভোগ করার মত বিপরীত প্রকৃতির ধারণের আনন্দ। আবার, ঘুরে ফিরে সে-ই বাজে কথা। হোক গে, কি আর বাকি রেখেছি বলতে। তাই সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ার পর জিজ্ঞেস করা, বলতো সীতা কার মাসী? তবু, তবু। পুরোনো হয় না আদিকাব্য, পুরোনো হয় না রাম-লক্ষ্মণ-সীতার বনগমন, গোদাবরী তীরের পঞ্চবটী বন থেকে ছদ্মবেশে রাবণের সীতা অপহরণ, বানর সেনার সাহায্য নিয়ে মানুষবেশী ঈশ্বরের আশীর্বাদপূত রামের লঙ্কা অভিযান, সীতা উদ্ধার, অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি। বারে বারে একই আখ্যান একই ব্যাখ্যান শুনি, শোনাই, প্রশ্ন করি নিজেকে, প্রশ্ন করি অন্যকে। অর্থাৎ এক কথায়, এ কাব্য চিরন্তন। আর অংশবিশেষের পারম্পর্য্যই বল, আর ব্যাখ্যাই বল,—বদলায় ঠিকই, তবু কাব্যের মূল সুরটি লেগে থাকে মনে, রক্তের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু-পরমাণুতে, দেহের শিরা উপশিরায়, আর জড়াজড়ি করে থাকা ওয়াটসন-ক্রীক মডেলের বংশগতির ক্রোমোজোমগুলির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা বংশগতির বৃহৎ অণুটির বংশ থেকে বংশান্তরে গমনের মাধ্যমে। তাই এ কাব্য,—মহাকাব্য। এ কাব্য চিরন্তন। ইংরেজীতে ক্লাসিক। মহাকাব্যের সংজ্ঞা কি? অনেকে অনেকভাবে খুঁজেছেন, যেমনটি খুঁজেছেন উপন্যাসের সংজ্ঞা, কি ছোটগল্পের সংজ্ঞা, কি কবিতার সংজ্ঞা, কি ছড়ার সংজ্ঞা, কি শ্লোকের সংজ্ঞা, কি দোঁহার সংজ্ঞা, কি শের-এর সংজ্ঞা, কি শায়েরী-র সংজ্ঞা। কোন সংজ্ঞাই পরিপূর্ণ হতে পারে না। বিভিন্ন গুণগত মান (attributes) নিয়ে গড়ে উঠেছে একাধিক সংজ্ঞা। তবে কি, প্রকৃত (abcoulcte) সংজ্ঞা বলে কিছু হয় না? না, এককথায় না। তবু আমরা বিভিন্ন গুণাবলীর মিশ্রণে বা সমন্বয়ে কিছুটা সংহত (compact or concise) সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করি, কিংবা বলতে হয় রূপরেখা সম্বন্ধে একটা ধারণা গ্রহণ করি বা প্রদান করি। সাহিত্যের বিভিন্ন শব্দের সংজ্ঞা এখন থাক। আপাতত, শুধুই মহাকাব্য। যে কাব্য জীবনের জটিলতার, জীবনের আনন্দের, জীবনের দুঃখের, জীবনের ব্যাথার, জীবনের আশ্লেষের, জীবনের

আবেগের, জীবনের কাম্যের, জীবনের অকাম্যের, জীবনের প্রাপ্তির, জীবনের অপ্রাপ্তির কাহিনী একাধিক চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক বিন্যাসের মাধ্যমে উপস্থাপনা করে, যে কাব্য রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, যুগের সংস্কৃতি, যুগের অপসংস্কৃতির একটা বিরাট রূপরেখা টেনে দিতে পারে এবং সর্বোপরি যে কাব্য ধরা এবং অধরার চরিত্রমিশ্রণে উদ্যোগী হয়, সেই কাব্যই মহাকাব্য। অতএব সবথেকে সফল মহাকাব্য কি? এবং কথায় উত্তর, জীবন; অর্থাৎ কিনা মনুষ্যজীবন। সাদা কাগজে আধুনিক পেনের দাগ বুলিয়ে গিয়ে কিংবা পাথরের উপর খোদাই করে কিংবা তালপাতার উপর পাখীর পালক দিয়ে কিংবা অন্য কোন বিশেষভাবে যত আখরই তুমি ফুটিয়ে যাও না কেন, তা কখনই পূর্ণাঙ্গ মহাকাব্যের রূপ পেতে পারে না—বড়জোর সম্পূর্ণের কাছাকাছি পৌঁছোনোর জন্যে আংশিক প্রচেষ্টা হতে পারে মাত্র। জীবনই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ মহাকাব্য। সবই আমাদের সেই মহানকে ছুঁয়ে দেখার 'কৌশিশ'; এবার, আরও ভিতরে চলে যাও। কি সেই জীবন যাকে নিয়েই এতকিছু। যতরকম সমাজতন্ত্র আছে, ততরকম সংজ্ঞা আছে। তেমনি যতরকম উপাদান নিয়ে মনুষ্যজীবন চালু থাকে, ততরকম সংজ্ঞাই জীবনকে দেওয়া যায়। জীবন বহুমুখী, তাই সংজ্ঞাও বহুমুখী, এবং কোন একটি সংজ্ঞাতেই একে ব্যাখ্যা করা যাবে না। তবুও, খুজি, এবং খুঁজে খুঁজে ফিরি। যখন জীবনে দুঃখ আসে, তখন মনে হয় দুঃখই জীবন, যখন আনন্দ আসে তখন আনন্দই জীবন, যখন ক্লেশ বোধ হয়, তখন ক্লেশই জীবন। কিন্তু ঐ যে বললাম, সবই অংশ, সম্পূর্ণে পৌঁছোনের আংশিক প্রয়াস মাত্র। তাই এসব মিলিয়েই জীবন। তবে সব থেকে বড় এবং সব থেকে প্রয়োজনীয় এবং সবের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যে উপদানটি জীবনের সংজ্ঞা নিরূপণে অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তা হল ভালবাসা। এটি আবার নিজেই একটি বৃহৎ আধার যা অনেক অনেক ক্ষুদ্র সংজ্ঞাকে নিজদেহে ঠাঁই দেয়। শ্রদ্ধা, স্নেহ, প্রীতি, আদর, যত্ন, উৎকণ্ঠা, সেবা, ত্যাগ, কামনা, বাসনা, আগ্রহ এতগুলি উপাদানে তৈরী এই মহান শব্দটি। খুঁটিয়ে দেখলে মনে হবে, যে উপাদানগুলির কথা বলা হল, তারা অর্থে একে অন্যের বিপরীত। কিন্তু, বিপরীত হলেও, বৈপরীত্যগুলির সমন্বয়ই পূর্ণতা দান করে। একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। শুধু হেড হলেই মুদ্রা নয়, শুধু 'টেল্' হলেও নয়—মুদ্রা সেটিই যার দুটি দিকই আছে। সেরকমই, ভালবাসায় প্রতিটি বিপরীতধর্মী গুণেরই সহাবস্থান প্রয়োজন। তবেই ভালবাসা পূর্ণ, স্বমহিমায় পরিপূর্ণ। দ্বৈতবাদ (dialectics) আর কি! হয়তো ঠিক বোঝানো গেল না, দ্বৈতবাদ

শুধুই মতবাদ,—একের বিপরীত—প্রয়োজনীয় বিপরীত। কিন্তু ভালবাসা শুধুমাত্র দ্বৈতবাদ নয়। এর সাথে মিলে-মিশে থাকতে হয়, মানুষের মনের অনুঘটকীয় বিক্রিয়া। অনুঘটক কি? যা কোন বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত বা মন্দীভূত করতে পারে নিজের উপস্থিতির মাধ্যমে। মনের বাড়া এজগতে আর কিছু নেই। এ পারে অসাধ্য সাধন করতে। বাস্তবে না হলেও কল্পনায় এ অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। বাস্তবে সম্ভব করার জন্যে আর একটি বিশেষ পদার্থের উপস্থিতি প্রয়োজন। তার নাম ভাগ্য। থাকগে, সবাই তা সমান ভাবে পায় না, তাই বাস্তব সব সময় এক নয়। ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে তা' ভিন্ন, পিছনে টেনে রাখার নানারকম বিরুদ্ধবাদী শক্তির অস্তিত্ব সত্ত্বেও একমাত্র ভালবাসা-ই মহাকাব্যের সাথে তুলনীয়—পরিধিতে, ব্যাপ্তিতে, আয়তনে, বৈচিত্র্যে, অনুঘটকীয় বিক্রিয়ায়, ব্যাখ্যার অতীত এমন সব কার্য-কারণ যোগে, যুক্তির অসম বিভিন্ন বিন্যাসে। আচ্ছা, বকবক করা, না কি বক্তৃতা দেওয়া, না কি অবলা নারীটিকে বোঝানোর তাল পেয়ে হাবি-জাবি বকে যাওয়া, না কি জ্ঞান বিতরণের এমন প্রশস্ত ক্ষেত্র ও পাত্র পেয়ে—না রেখে, না ঢেকে, না থেমে, না থামিয়ে ছন্দহীনতায় নেচে যাওয়া এগুলো? জানি না, অনেক কিছুই বুঝি না। শুধু এটুকু বুঝি, যা বলি, তা একতরফা বলি না, তা monologue-ও নয়, soliloquy-ও নয়। তা কথোপকথন, তা dialogue। বা রে, অন্যের কথাগুলি কই তবে? যেমনটি থাকে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের খাতার পাতায়, যেমন থাকে নাটকে, বেতারনাট্যে, চিত্রনাট্যে? কোথায় তবে আর সব কুশীলবরা? আছে, আছে। তবে কুশীলবরা সংখ্যায় মোটে দুজন। এরাই বলে, এরাই শোনে। এ বলে অন্যকে, ও বলে আরেকে। আরে, তাও যে দেখতে পাই না—এ কি প্রচ্ছন্ন চরিত্র রে বাবা? এ কি তবে আগের দিনের যাত্রার বিবেক, না কি কল্পনার সামগ্রী? না বাপু না, কল্পনা-টল্পনা কিছু নয়, বিবেক-টিবেকও নয়। এ আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে রোমকূপের শিহরণে, কখনও ডানপাশে, কখনও বাঁ পাশে, কখনও বুকের মাঝে, কখনও বা লেখার আখরে, কখনও বা শয়নে, কখনও বা স্বপনে, আবার কখনও বা জাগরণে। বেশ মজা, কি বা বাদ রইল? অর্থাৎ, যিনি লিখচেন, তাঁকে বাদ দিয়ে বাকি ব্যক্তিটির উপস্থিতি যে দেখি সর্বত্র। হ্যাঁ বাপু, এ যদি বুঝে থাক, তবে তো সার বুঝ বুঝেই গেলে, পেয়ে গেলে কানের ভেতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া গুরুর দীক্ষামন্ত্র, উপলব্ধি করলে পুরুষের সাথে প্রকৃতির আত্যন্তর মিলন প্রত্যক্ষ করলে অমাবস্যায় চাঁদের উদয়। বুঝে দেখ, শুক্লপক্ষে চাঁদ তো থাকবেই; কিন্তু কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ সে সময় দেখি না বলে, চাঁদ আলো প্রতিফলিত হয়ে সূর্যের

অভাব অংশত ভরিয়ে তোলার থেকে, তার স্নিগ্ধতা থেকে আমাদের বঞ্চিত করে বলেই তা কৃষ্ণপক্ষ। তবে যদি সে পক্ষেও চাঁদ দেখ? তখন কি বলবে? পক্ষের স্বতন্ত্র উপস্থিতি আর বুঝতে পারবে না, প্রকৃতি তখন 'নিশীথ সূর্যের দেশ, এর মতই চিরকাম্য অলৌকিক ও নৈসর্গিক অনুভূতি। পক্ষের এবং বিপক্ষের মিলিত রূপে শুধু রূপ—রূপ, রূপ, রূপ কিংবা অরূপ। দেখো বাবা, অরূপ কিন্তু কোন লোকের নাম নয়। এসব ঠাট্টা-তামাসার সময় এখন নয়, এখন এসব নিয়ে ঠাট্টা করার মত সম্পর্কও তোমার সাথে আমার নয়। তাই তো? না কি? অতএব, শুধুই অরূপ– অপরূপ রূপ,—রূপহীন রূপ নয়—রূপের মাঝে অরূপ—বিভিন্ন রূপের মিশ্রণে বস্তুহীন, কণাহীন এক রূপ—নির্গুণ ব্রহ্ম নয়, সগুণ পুরুষ (কিংবা প্রকৃতি)। চরে চরে ভিন্নচর নয়, চর চর। তবে কিনা, বড় কঠিন কথা। ভেল্কি জানি নাকি? এক হল দর্শকের সামনে বিজ্ঞানের কারুকার্যে, অথবা হাতের কায়দায় দিনকে রাত করে দেখানোর, কিংব রাতকে দিন, কিংবা অমাবস্যাকে পূর্ণিমা বা পূর্ণিমাকে অমাবস্যা। তবে তা যদি বুঝে থাক, তবে ছাই বুঝেছ। তাই বা বলি কি করে? যে ছাই-ই দেখে সব সময় সে-ই কেবল ছাই দেখতে পায়, আর যে ছাইয়ের নীচে স্ফুলিঙ্গ খুঁজতে জানে, আগুনের শিখা যাকে ছুঁয়ে চিনতে হয় না, রং দেখে বাছতে হয় না, যার চারিত্রিক অনুভূতি আগুনকে খুঁজে নিতে জানে—সে উপরের ছাই সযত্নে এক লহমায় পেড়ে ফেলে ভিতরের আগুন থেকে উত্তাপ নেয়। প্রয়োজনে সেই আগুনকেই ব্যবহার করে রান্নার কাজে জল গরম করতে, সেঁকতে, শুকোতে—এমন কি সোনার সাদা সিগারেট বা খাকি বিড়িটিকে ধরিয়ে দিয়ে সুখটান দিতে। এক আগুন থেকে অন্য আগুন। আগুন বেঁচে থাকে পরম্পরায়। কোন এক যুগে যেন, পাথরে পাথরে ঘসে এক পূর্বপুরুষ চকচকে স্ফুলিঙ্গ পেয়ে গেল। সে মহাপুরুষ। সে দান করে গেল আগুনকে, বংশধরদের কাছে। কেউ সে আগুন চিনতে পারল, কেউ বা ছাইয়ের অতলে হারিয়ে ফেলল। তাই বলি, যে চেনে সে সার্থক! সার্থক শুধু সে নয়। আগুন নিজেও। দেবতা তখনই সার্থক তখনই সফল যখন মানুষ তাকে ডাকবে, পুজো করবে, মানবে। মানুষ তখনই সার্থক যখন সে তার সীমাবদ্ধতা জানবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কাজ করে যাবে। সার্থকতা পরিপূরক—এ পাত্রের সাথে অন্য পাত্রে। অন্ধকারের মাঝেও নীরব নগ্নতা ভেদ করে, যখন আলো উঁকি দিতে পারে, অন্ধকারের স্তব্ধতাকে, ধৈর্য্যকে যখন খানখান করে দিতে পারে, তখনই চাঁদের উদয়—কৃষ্ণপক্ষের পূর্ণতায় আমাবস্যায়। তাই ভালোবাসা আমার সংজ্ঞায় আখ

বোঝাই গরুর গাড়ী নয়, লেপটে থাকা আত্যন্তর অনুভূতিটুকুই শুধু নয়—এ সংক্ষেপে, ছোট, সীমিত কথায়, অমাবস্যায় চাঁদের উদয়।

আমার অনুভূতির, অন্তত, সে পূর্ণ দিন আর রাতের অনুভূতির, আমার ভালবাসার, আমার তৃপ্তির এই ব্যাখ্যা এই রূপের বিবরণ পর্যন্ত লিখেছিলাম, ভেবেছিলাম, এটুকুই থাক। জানি, তুমি আশা করে থাকবে আমার মুখ থেকে কিছু শোনার জন্যে। অন্তত মুখে না হলেও কলমের আঁচড়ে (যে আঁচড় শুধু আঁচড়ে সমাবদ্ধ থাকে না, শক্তিশালী দাগে পরিণত হয়ে ক্যানভাসে স্থায়ীরূপ নেয় বলেই অন্তত তোমার ধারণা) কিছু পাওয়ার জন্যে। সে প্রকাশ বাহুল্য, কারণ অবাঙ্ময় সুখী রূপ তুমি আমার অজান্তেই দেখে নিয়েছি যেমনটি দেখে নিয়েছি আমি, একান্ত সংগোপনে, চুরি করে, তোমার সুখী রূপটি। তাই ভেবেছিলাম দেরী না করে এবারের মত তোমার কৌতুহল সংক্ষেপে মেটাই। লিখতে লিখতে (অথবা বাস্তব বা অবাস্তব বকতে বকতে) এর থেকে সহজ স্বচ্ছন্দ অনুভূতি আর খুঁজে পাইনি। অমাবস্যায় চাঁদের উদয়—কে বা কি অমাবস্যা আর কে বা কি চাঁদ, তা তোমার মত বুদ্ধিমতী মেয়েকে বেশী ব্যাখ্যা করে বোঝানোর দরকার নেই। খুব সংক্ষেপে হৃদয়ঙ্গম করে নিতে পারা তোমার একটা বড় গুণ, যেমন বড় গুণ, কিছু অপ্রকাশ্য রেখে, কিছুটা প্রকাশ করে আর বাকিটা বোঝার ব্যাপার অন্যের ঘাড়ে ফেলে। এমনটিই হওয়া উচিত। আরে, সব বলে ফেললে তো গদ্য হয়, কিছুটা না বলা থাকলে হয় ছোটগল্প আর অনেকটাই বুঝে নেওয়ার দায় থাকলে তা হয় কবিতা। গদ্য সুন্দর, ছোট গল্প অপরূপ, কবিতা নিরূপম—মধুর জ্যোৎস্না। নিথর বনে যা শিহরণ জাগায় অদ্ভুত ভাবে, আন্তরিক ভাবে—যার প্রলেপ গা থেকে মুছে ফেলা যায় না। শীতের রাতে নিঝুম শব্দহীন অন্ধকারকে যখন নবীন জ্যোৎস্না ধুয়ে মুছে স্যাফ করে দেয়, বটের আঠার মত ঘন হয়ে যখন কুয়াশা আর জ্যোৎস্না একাকার হয়ে যায় আর যখন পরের দিনের ভোরের আলো অল্প অল্প করে চাদরটাকে সরিয়ে প্রকৃতিকে অপরূপ উন্মুক্ত করে দেয় তখন হয় কবিতা। গদ্য পড়ার, ছোটগল্প আরও কিছু পাওয়ার প্রত্যাশার আর কবিতা উপলব্ধির, অনুভূতির।

অধ্যায়—৬

নিস্প্রাণ পাথরের বুকে ঢেউ জেগেছে। পাথর ভেঙে আজ ঝর্ণার জলোচ্ছাস। এর কলতানের সুললিতরূপই তুমি সেদিন আমার চোখে দেখেছ।

আবার, কান্নাও দেখেছ। কান্না বিষাদের, কান্না বিবর্ণতার, কান্না অসহায়ত্বের। কথা বলার বা লেখার এই সুবিধে। অনেকটা সিঁড়ি-ভাঙা অঙ্কের মত। ধাপে ধাপে এগোতে পারলে সমাধানে পৌঁছানো যায়। তেমনি এখন আমি বোধহয় সেই সমাধানে পুরোটা না হলেও কাছে-পিঠে পৌঁছেছি বোধহয়। এ অসহায়ত্ব কি তা বোধহয় তোমাকে সঠিকভাবে আমি বুঝিয়ে উঠতে পারবো না। তবু, উপায় নেই। তাই দুচোখ বেয়ে আজ জমে থাকা বাষ্প ধারা হয়ে ঝরে পড়ে। তাই বলে শুধুই কাঁদি না, হাসি, মজাও করি। যখন সেই রসে আপ্লুত হই, তখন মুখের ওপর ফুটে ওঠে বোধহয় সেই অমৃতত্ব যা যুগে যুগে মুনি ঋষিরা ধ্যানে কামনা করেছেন, যোগীরা যোগ বলে অর্জন করতে চেয়েছেন, তান্ত্রিকরা শিরা উপশিরা ধমনীর নিয়ন্ত্রিত গতিবিধির বলে হেলায়, স্ব ইচ্ছায়, স্ব-সময়ে অর্জন করতে চেয়েছেন, ত্যাগী মহাপুরুষরা চেয়েছেন ভোগের কিংবা ত্যাগের মাধ্যমে আস্বাদন করতে।

জন্মের পরে জন্ম হলে তাকে বলে পুনর্জন্ম, জন্মের মধ্যে অন্যরকম জন্মলাভ করলে তাকে বলে দ্বিজত্ব আর যে জন্মের অনুভূতিক ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু নেই, তাকে বলে পুনরুত্থান। বাইবেলের ভাষায় Resurrection। শুধুমাত্র মহাপুরুষদের জন্যই এই শব্দটি নির্দ্দিষ্ট কিনা আমার জানা নেই, তবে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আনুভূতিক অর্থে প্রয়োগ করলে Resurrection তাঁদেরও হতেই পারে। অন্তত আমার ক্ষেত্রে তাকে উপলব্ধি করেছি। এমন সরল সাবলীল ছন্দে নৃত্যের তালে তালে অমৃত আস্বাদনে ক্লান্তি নেই। এই অমৃতই তো মৃতসঞ্জীবনী, একে পাওয়া গিয়েছিল সমুদ্র মন্থন করে, এর জন্যেই দেবতা—অসুরের সংগ্রাম, এর জন্যেই কাব্যের লিখন আর মহাকাব্যের সৃজন। এ বারবার খেতে সাধ জাগে। তবু বলি, ভাগ্যই সব—অন্তত আমাদের দুজনের সম্পর্কের বিষয়ে। তাই যদি আর কখনও এ অমৃতের আস্বাদন থেকে বঞ্চিত করে ঈশ্বর 'অমৃতস্য পুত্রা' হওয়া থেকে আমাকে বঞ্চিত করেন, তবুও এ স্মৃতি চিরজাগরী হয়ে 'থাকবে—নিশীথ স্বপন সম' স্মৃতি ঝরে পড়বে না—কবির কামনা যাই হোক। অন্ধ বিভাবরী জাগরণে কাটবে, পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে পাগল আমার মন জেগে উঠবে। একটা অভাব রয়ে গেল—এখনও তোমার গলায় বসন্তকে আবার ফুটিয়ে তুলতে পারলাম না বলে। আবারও চেষ্টা করব, অসীম ধৈর্য্যে, সান্ত্বনায়, আবেগে আর আদরে যাতে সেই সুর তুমি ফিরে পাও। সেদিন বোধহয় আমার মুখ তুমি আরও উজ্জ্বলরূপে দেখতে পাবে। দেখো বাবা, আবার কুন্তীর মতো সেই ছটায় ভয় পেয়ো না, অম্বা

বা অম্বালিকার মতো ব্যাসদেবের রূপের ঔজ্জল্যে চোখ ঢেকে ফেলো না কারণ তাতে আমি যে তোমার খুশী দেখার থেকে বঞ্চিত হব। কাইন্দো না গো কন্যে. তোমার তরে বইস্যা রহি সকাল থেকে সন্ধে। বুঝলে তো, ছন্দ এসে গেলো, মনের ভেতর যে ছন্দের অনুরণন প্রতিনিয়ত আমায় উন্মনা করে তোলে, দেখার জন্যে. একবারের জন্যে দীঘল কালো চোখের গভীরতা মন ভরে চেটে পুটে নেওয়ার জন্যে আমার রক্তে দোলা জাগায়, তা বাণী হয়ে ফুটে ওঠে। কিন্তু আবারও সেই, শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু. হে প্রিয়—এযে আমার অনেকদিনের সাজানো সম্পদের ঝকমকানি যা রাজার দরবারে ভেট দিয়ে প্রজা কৃতার্থ হয়। রাজার কাছে প্রজার লাজ সরম থাকতে নেই—এ দিয়েই আমাদের সনাতনী সংস্কৃতির শুরু, ভেদ শুধু বর্ণের পরম্পরায়। ব্রাহ্মণের কাছে তা দেবার্চনা, ক্ষত্রিয়ের কাছে অস্ত্রগুরুর কাছে সাধনা. বৈশ্যের কাছে দেবী লক্ষ্মীর বাহন থেকে শুরু করে তাঁর সর্বময় রূপের কাছে উৎসর্জন আর শূদ্রের কাছে তা শুধুই উৎসর্গ, প্রভুর কাছে। দেখ, মজাটা কোথায়? সবার বেলা-তেই এ জিনিষ উৎসর্গ, শুধু যাঁকে দেওয়া হবে তাঁর রূপের রূপ স্বতন্ত্র। তবু সেই কথামৃতের কথায়, পূজো যে রূপকেই কর না কেন, পূজো এক জায়গাতেই পৌঁছোয়। পূজো যার, তিনি তো অরূপ, অরূপ রতন। অতএব আর কি. আমার পূজোও যাঁর, তোমার পূজোও তাঁর। পূজো পৌঁছোক একজায়গায়. আমরা দুয়ে হই একঠাঁই। সব গুণ মিলে মিশে গুণিতক হয়ে যাক, আর গুণের সাথে যদি কিছু অগুণ থাকে, তা মিলেজুলে হোক গুণাগুণ। এই তো সব কথা। দুঃখ নয়, আনন্দ নয়, বিষাদ নয়, হতাশা নয়—এমন লয়ে আমরা পার্থিব মানুষ পেয়ে উঠতে পারি না বলেই আমরা মানুষ—মানব নামক একটি রক্ত-মাংস-হাড়-মজ্জা-কান-নাক এরকম বেশ কিছুর সমষ্টি। আর তিঁনি গুণাগুণের ঊর্দ্ধে তিনি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন না বলেই আমার ধারণা। তোমাকে বলেছিলাম না, আমরা পৃথিবীতে জন্মাই কারণ আমাদের স্বর্গে থাকার উপযুক্ত বলে মনে করা হয়নি; যদি কোনদিন সেইসব গুণ কেউ আয়ত্ত করতে পারে. অর্থাৎ কিনা গুণাগুণের ঊর্ধ্বে আরোহণ করার মত গুণ তাহলে তাঁর হয় উত্তরণ কিংবা মোক্ষ, কিংবা নির্বাণ। যিঁনি পারেন .তাঁর নাকি আর পুনর্জন্ম হয় না, যদি অবশ্য পুন-র্জন্ম বলে কিছু থেকে থাকে। তবে মানব না মানব না করেও মানতে হয় বৈকি. বিশেষ করে যখন হাতে একগাদা প্রমাণ হাজির হয়ে যায়। এককালে জন্মান্তরবাদকে বিশ্বাস করতাম না, এখন করি। তার প্রমাণ তো তুমি, স্বয়ং তুমি। থাকো স্বর্গ, হাস্যমুখে, কর সুধাপান দেবগণ ......। স্বর্গ তোমাদেরই

সুখস্থান, মোরা পরবাসী / ধরাতলে দীনতম ঘরে। যদি জন্মে প্রেয়সী আমার / সে বালিকা বক্ষে তার / রাখিবে সঞ্চয় করি সুধার ভাণ্ডার / আমারি লাগিয়া সযতনে / সন্ধ্যা হলে জ্বলন্ত প্রদীপখানি ভাসাইয়া জলে / শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে চাহি একমনা / করিবে সে আপনার সৌভাগ্য গণনা / একাকী দাঁড়ায়ে ঘাটে। এই আমাদের কামনা বা কাম্য হওয়া উচিত,— স্বর্গে নয়, মর্ত্যে। মর্ত্যেই আমাদের খেলাধূলো, প্রেম, প্রণয়, জন্ম মৃত্যু। এ নিয়েই আমরা সাধারণ লোক সুখে থাকতে চাই। সুখ আবার কি ? সেই যে গো, শোননি, সেই রসিক লোকের কথা, যখন যা চাই, তা-ই পেলেই সুখ, আর যদি চাওয়া জিনিষ পেয়েও পরে ভুল চাওয়া হয়েছে বলে মনে হয় তখন অন্যের ঘাড়ে ভুলের দোষভার চাপিয়ে দিতে পারলে, তবেই সুখ। মা গো মা, তাই তো উত্তরণের শেষ ধাপে দাঁড়িয়েও বলতে পারেন কেউ কেউ, কিছুই পেলাম না। পেলাম না আবার কি গো ? হয়তো, চাওয়ার মতো করে চাওয়া হয়ে ওঠেনি তাই পাই নি। আর চাওয়ার মত করে যা চাইলাম তা তো পেয়েই গেলাম। অতএব দুঃখ কিসে বা ? জানিনা, দুঃখ কি সে হয় / অভাগারা (গু-গা-বা-বা) যেন তাঁর দানকে দুচোখ ভরে দেখতে পারি, তাঁর মহিমা যে তোর মাঝেই দেখলাম। আয়রে তোকে আদর করি, মনের আবীরে তোকে রাঙাই, তোর রূপ দেখি আর অরূপের চাকচিক্য মাখা রতনের ছোঁয়া পাই। ঈশ্বর তোকে ক্ষমতা দিন আরও আরও, যার মধ্যে দিয়ে আমি তাঁরেই দেখতে পাব, তাঁর রস মন-প্রাণ দিয়ে উপভোগ করতে পারব।

দেখার জন্যে পৃথিবীতে এসেছি, দেখে গেলেই হল। শুধু যা দেখব, তার মূলরূপ যেন উপলব্ধি করার ক্ষমতা তিনি আমাকে দেন। তবু, আমিও চিরন্তন নই, তুমিও নও—কেউই নয়—পার্থিব আয়ুর অর্থে। হায়রে হৃদয় / তোমার সঞ্চয় / দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথ প্রান্তে ফেলে যেতে হয় / নাই, নাই যে সময়। তবুও দুঃখ নেই। যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি, সে মুহূর্তে কিছু তব নাই / তুমি তাই / পবিত্র সদাই / তোমার চরণস্পর্শে বিশ্বধূলি / মলিনতা যায় ভুলি, পলকে পলকে / মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে / ঝলকে ঝলকে। ' সেইজন্যেই তো বিস্ময়ে, তাই জাগে / জাগে আমার প্রাণ আকাশ ভরা সূর্য্যতারা / বিশ্বভরা প্রাণ / তাহারই মাঝখানে / আমি পেয়েছি / পেয়েছি মোর স্থান। হে পরমব্রহ্ম, অভাব থেকে, দীনতা থেকে, মালিন্য থেকে আমায় মুক্ত করো।

অধ্যায়— ৭

গলা আমার সংপৃক্ত – সংপৃক্ত বিষে—নীল গরলে—সুনীল দাহে। দাহ কখন নীল, আর তারপর সুনীল। কখন হয় জানো ? জারণ শিখা বা জারক

শিখা দেখছো ? রসায়নাগারে দেখানো হয়—হাতে কলমে কাজ শেখানোর সময়। সেই যে গো, বুনসেন বার্ণার বা স্পিরিট ল্যাম্প। কাজ না করে থাকলেও নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। যেই আগুনে বেশী অক্সিজেন এসে যায় ব জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, হলুদ আগুন বদলে যায় নীল। এ আগুনের জোর বেশী, মানে তাপ বেশী। নীল বিষেরও তাই দাহ করার ক্ষমতা বেশী, অথবা এত বেশী জ্বলুনিকে তুলনা করা হয় 'নীল' রংয়ের সাথে। কিন্তু তাহলে সাদা নয় কেন ? আগুনের তাপ খুব বেশী হলে বিজ্ঞানের ভাষায় আমরা বলি 'শ্বেত তপ্ত'—সাদা আগুনের আঁচ বেশী। বোধহয় তা নয় এ বোধহয় অন্য তুলনা। দারুণ আগুনের আঁচ সহ্য করা যায় না—তাই ত 'সাদা'-র সাথে তুলনীয়—সররঙের সমাহার—অর্থাৎ কিনা, একত্রে। সব কি একসাথে সহ্য করা যায় ? যায় না ? নীলকণ্ঠ শংকর কিন্তু সৌম থেকেই এত তীব্র গরল কণ্ঠে ধারণ করেন—তাই তা নীল, সাদা নয় তাই সংপৃক্ত দ্রবণে আর একটু বিষ দিলেও বোধহয় সহ্য করতে পারব—খু বেশী হলে তা অতি-সংপৃক্ত দ্রবণে পরিণত হয়ে কেলাস (Crystal) তৈরী করতে পারে আর কি।

ঘুরে ফিরে পাগল সেই সাঁকোতে ফিরে আসে। আমিও ফিরে আসি কামনায়। অনেক অনেক কামনা আমার। কোথায় ছিল এরা ? অনেক অনেক দিন নেড়ে চেড়ে দেখা হয়নি—কোথায় যেন কল্পনায় থাকতে থাকতে পুরোপুরি রূপকথার পরী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, আসতেই হলো তাকে ফিরে—রূপকথার পরীই বল আর স্বর্গের উর্বশীর মত মানসকন্যাই বল, আর সমুদ্রের মৎস্যকন্যাই বল, আকুল টানে তাকে আসতেই হল। এ বোধহয় আমার কল্পনার জয়। এ কামনায় কোন কলুষতা নেই, নেই কোন বিভ্রান্তি—তাই অনুপম। আমি তৃপ্ত, আমি পূর্ণ।

তবু, এখনও বোধহয় বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে নেওয়া ফুটন্ত গোলাপ হতে পারিনি,—হতে পারিনি পূর্ণ প্রস্ফুটিত। অপেক্ষা করে আছি, সকাল না বাজার জন্যে—যখন গোলাপ না হতে পারলেও বুনো নটামনি হয়ে বেঁচে থাকতে পারব। আর পুরো গোলাপটা ফোটার তো নির্দিষ্ট সময় জানা নেই। গোলাপ কখন ফোটে, রাতে না সকালে ? ঠিক জানি না, কেউ কেউ বলেন, সে ফোটে ঠিক মাঝরাতে, কেউ বা বলে যখন শুকতারাটা নতুন আকাশের দিলখোলা রূপে বিবর্ণ হতে থেকে আপন সত্তায় মিশে যায়, তখন যখনই ফুটুক না কেন, সে হলো গিয়ে ফুলের রাজা। আর সবাই তার প্রজা তাই, হলে গোলাপটিই হতে চাই—সে কাশ্মীরের বিখ্যাত লাল গোলাপ

সাদা গোলাপই হোক না কেন বা আগ্রার বাগানে ঔরংজেবের প্রযত্নে গড়ে ওঠা বসরাই গোলাপের সমারোহই হোক না কেন আর রাজস্থানের মরুভূমির বুকেও লীন হয়ে থাকা জলের প্রভাবে ফুটে ওঠা কালো গোলাপই হোক না কেন। গোলাপ সুন্দর শুধু তার রূপের রাজৈশ্বর্যে নয়, সে সুন্দর তার আভিজাত্যে, তার গন্ধে, তার রংয়ের বৈচিত্র্যে, তার গাম্ভীর্যপূর্ণ আড়ম্বরে। আমি গোলাপ হয়ে ফুটতে চাই, তোমার চুলের উপর তোমার শোভার বর্দ্ধিত সৌন্দর্য হয়ে। সুন্দর মাথায়, সুন্দর চুলে শোভা পেলে গোলাপের সৌন্দর্য আরও বাড়ে চুলও চুরমার হয় সৌন্দর্য্যের স্নিগ্ধতায়। এখন, রাত আমার কাছে আবার সেই ছোট্টবেলাটির মতো হয়ে গেছে। শুধু বদলে গেছে তার প্রেক্ষিত, তার পটভূমি, তার কল্পনার ক্ষেত্র। ভূতের ভয়, আঁধাররাতে পাঁচিলের ওপরে নারকেল গাছের নীচে আলোছায়ার দোলদোলানি, জ্যোৎস্না-ভরা আকাশের পরীমাখা রহস্য-রোমাঞ্চ বা অমাবস্যার রাতের বুক চিরে অরোরা বেরিয়ালিস বা অরোরা অসট্রালিস-এর কামনা অতিক্রম করে, নিঘুম নিস্তব্ধ বুক চাপা পাথরের বুকে চিড় ধরিয়ে সে এখন এক নতুন পাওয়ায় মগ্ন। সে পাওয়া পিছনে ফেলে আসা অনেকগুলো ঘুম অতিক্রম করে এক দীর্ঘনিদ্রা। আগুন এত মধুর হয় জানাছিল না, কিন্তু মানুষ আগুনকে পরীক্ষা বলে ধরে নিল। তাই আগুন হয়ে গেল পবিত্রতার আর এক নাম, আগুন দিয়ে হতে লাগলো সতীত্বের পরীক্ষা। আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে পার হতে পারার মধ্যে হাত লাগলো বৌদ্ধ ভিক্ষুর কৃচ্ছ্রতা সাধনের পরীক্ষা। আগুন দেখা দিল সহ্য-শক্তি পরীক্ষার আর এক রূপ হয়ে। আগুন তাই পুরাণে হল অগ্নিদেবতা, কাব্যে হল জ্বালানি আর কবিতায় হল তাকে অতিক্রম করে স্নিগ্ধতায় উত্তীর্ণ হতে পারার আর এক নাম। আমি সেই মৃত আগ্নেয়গিরি থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসা একরাশ লাভার সৌন্দর্য দেখেছি আমার নিজের মধ্যে। আর কি দেখেছি জান ? আচ্ছা, তুমি কি তুবড়ী বা চরকির হাল্কা নীল আগুন দেখেছ ? দেখেছ কি এক তুবড়ী থেকে আর এক তুবড়ি ধরানোর বা এক আগুন থেকে আর এক আগুন ধরানোর মজার খেলা ? না দেখে থাকলে, আমার দেখার অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করে নাও। কারণ, এখন এ দৃশ্য খুব সুলভ নয়। ছোট-বেলায় দেখেছি, শান্তিনিকেতনে কোন এক বিশেষ শীতের রাতে (সম্ভবতঃ বা যতদূর মনে পড়ছে পৌষ সংক্রান্তির রাতে) সারা রাত ধরে বাজী পোড়ানোর মহোৎসব চলত। সে এক অদ্ভূত দৃশ্য। সারারাত ধরে ছোটনাগপুরের ক্ষীণ হয়ে আসা পাহাড়ী রেখার বুকে, চাপ ধরে আসা, শ্বাসরোধ করা হিমের ভিতরেও শয়ে শয়ে লোক এই উৎসবে নিজেদের পয়সা খরচ করে অংশ নিত,

আর উপভোগ করত হাজার হাজার উল্লসিত বেবাক জনতা। ওঃ, এখনও আমার দৃশ্যপটে সে ছবি লেগে আছে। আমি দেখেছি, আগুন থেকে আগুনের মধুর স্ফীতি বা ব্যাপ্তি। এ আগুন মানুষের মনেও আছে, দেহেও আছে। সেদিন দীঘায় রাতে একঝলক মনে পড়ে গিয়েছিল, সেই অদ্ভুত সৌন্দর্য্য, সেই আগুনের প্রশস্তি, আগুন থেকে আগুনের নির্বাক অথচ সতেজ ব্যাপ্তি। আগুন যখন আর এক আগুনের স্পর্শ পায় কিংবা ঘুমন্ত কিছুকে নিজের ধর্মে দীক্ষিত করতে পারে, তখন আগুনের যে কি আনন্দ! সেই আনন্দ আমি পেয়েছি। সময় স্বল্প হলেও আমি তখন ছিলাম ওঁং, ছিলাম ব্রহ্ম, ছিলাম দেবতা--স্বর্গ থেকে মর্ত্য—বুক থেকে আরও নীচে, কিংবা চুলের সবথেকে উঁচু জায়গাটা থেকে পায়ের সব থেকে নীচের জায়গাটা পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত, সর্বব্যাপী, আগ্রাসী অথচ ভীষণ, ভীষণ ভাবে জারিত, সংপৃক্ত, তৃপ্ত। তাই লেখা আর এগোয় না, কিন্তু এগিয়ে চলে মনে মনে কথা বলা, এগিয়ে চলে তৃপ্তির আকাঙ্খা, এগিয়ে চলে সুতৃপ্তির আস্বাদ। তাই তখন আবার আলো জ্বালিয়ে কাগজ কলম হাতে নিয়ে ছন্দপতন ঘটাতে মন চায় না। মন তৃপ্তি খোঁজে, সে তখন পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে, আর পাখির ডাকে জাগে।

আগেও কথা বলে চলতাম নিজের মনে মনে। আর এখনও কথা বলে চলি! তবে তফাৎ নিশ্চয়ই একটা কিছু আছে। নিজের কাছেই নিজে প্রশ্ন করছি, কি সেই তফাৎ? জানো তো, খোঁজা আমার একটা অভ্যেস—সে নিজের মনে মনে ডুব সাগরেই হোক আর নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের বুকচিরে টর্চের আলো জ্বেলে কোনো অজানা স্থানের সন্ধানই হোক। সেই তাগিদেই খুঁজছি। অনেক সময় অনেক ভেবেও সন্ধান পাই না কোন কিছুর, কিন্তু সরস্বতীদেবীর একটা বিশেষ কিছু আশীর্বাদ নিশ্চয়ই আছে। মনের অতলের যে সন্ধান অনেক সময় মস্তিষ্কের ধূসর পদার্থ আমার মনের ক্যানভাসে রংয়ের ব্যাখ্যা জানাতে পারে না, সেই ব্যাখ্যাই আবার সাদা কাগজের উপরে নীল আঁচড়ের ভেলা টানতে টানতে পেয়ে যাই। তখন অগাধ তৃপ্তি আসে। জানোই তো, কিছু খুঁজতে বসে খুঁজে না পেলে কি ভীষণ বিরক্তি আসে। আর যখনই মনে হয়, এই তো পেয়ে গেলাম যার সন্ধান তাঁকে, তখন কি অপার প্রশান্তি যে আসে। সেই সন্ধানই তো জীবনভোর করে চলেছি। যখন সন্ধানে ক্লান্তি আসে, তখন তোমার প্রিয় শিবঠাকুরটি তার শিবত্ব হারিয়ে ফেলে, সে তখন জড় পদার্থ। তবে ধার্মিক পুরুষরাও বলেন, দার্শনিকরাও কেউ কেউ বলেন, জড়ের মাঝেও জীবনের উপাদান থাকে। আর বৈজ্ঞানিকরা তো বলেনই।

সেই যে গো, প্রোটন, ইলেকট্রন, নিউট্রন, মেসন, ভি-কণা এইসব হাবিজাবি ছোট্ট ছোট্ট জিনিষগুলো অথবা কিনা, অজৈব হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, কার্বন কিংবা জৈব মিথেন, ইথেন, নিউক্লিক অ্যাসিড, অতশত ফিরিস্তি থাক, মোদ্দা কথাটা হল গিয়ে, জড় শংকরের মাঝেও থাকে নটরাজের চঞ্চল শিব। তাই না, দশ-দশটা বছর পাথর চাপা হয়ে থেকেও নটরাজ তার নটরাজের নৃত্যের ছন্দ ভুলে যায় নি—পাষাণ অহল্যার বুকেও ধুক পুক করছিল প্রাণের আশ্লেষটুকু। দরকার ছিল শুধু পার্ব্বতীর সদম্ভ কামনা, শিবের ঘুমভাঙানো বা ধ্যান ভাঙানো কিংবা রামের মৃদু পাদস্পর্শ অহল্যার পাষাণবুকে। তাই তো তোমার শংকর আবার জেগে উঠল—তোমার অমৃত ছোঁয়ায়। সেজন্যেই মন গেয়ে ওঠে, কেমনে বর্ণিব তোমার রচনা / কেমনে রটির তোমার করুণা / কেমনে গলাব হৃদয় প্রাণ / তোমার মধুর প্রেম। সুর নেই, কিন্তু কথা আছে—রং নেই সাত রঙা, কিন্তু তুলি আছে, ক্যানভাস আছে। তাই তো মিষ্টি, তোমার কাছে সুর চাই, তোমার হাত থেকে গোলা রং চাই। প্রতীক্ষা ছিল সুরের, অপেক্ষা ছিল রঙে-র। যেই না পেলাম, অমনি গোধূলি গগনে মেঘে / ঢেকেছিল তারা / আমার যা কথা ছিল / হয়ে গেল সারা / গোধূলি . / হয়তো যে তুমি শোন নাই / সহজে বিদায় দিলে তাই / আকাশ মুখর ছিল যে তখন / ঝরঝর বারি ধারা / গোধূলি .. / চেয়েছিনু যবে মুখে / তোল নাই আঁখি / আঁধারে নীরব ব্যাথ্যা / দিয়েছিল ঢাকি। জানি না, আর কি কখনও হবে / এমন সন্ধ্যা হবো । তবু আশায় থাকি, আমার পার্বতীর প্রেম যেন কভু না হউক ম্লান। ম্লান হয়ে গেলেই শঙ্কর একা অসহায়। কিন্তু বিশ্বাস দিতে যখন পেরেছ, কেড়ে নিশ্চয়ই নেবে না। বলেছিলে না, এসব পেলে শঙ্কর উদ্যমী হয়ে ওঠে, প্রাণশক্তি পেয়ে একা হাতেই সব কাজ করে নিতে পারে, আর পার্বতী ক্লান্তি মাখা স্বপ্নের মাঝে বিচরণ করে। উদ্যম কাম্য শংকরের, ক্লান্তি কাম্য পার্বতীর। তাই তো, পার্ব্বতী ক্লান্তি (থুড়ি, আশ্লেষ, আভোগ)-এর সময়টুকুতে চায় শঙ্কর নাউঠুক, তার নিজের সমস্ত আদর দিয়ে জড়িয়ে রাখুক অকৃত্রিম রূপের পার্ব্বতীকে। দুজনের চাওয়াই মিটে গেলে দুজন দুজনকে আরও ঘনিষ্টভাবে জড়িয়ে ধরে। একটু পরেই আবার অমৃত সাগর মাঝারে ডুব দিতে চায়। কাম্যধন আছে কোথা—তা খুঁজে বেড়ায় শংকর, তাই তো স্বর্গের কোল থেকে ছিঁড়ে নেওয়া এক চিলতে আলো দিয়েও তার খোঁজা হয় না সারা—পাছে, কোন পরশমণির কণাও অপ্রাপ্য থেকে যায়। তোমার গান যে কত / শুনিয়েছিলে মোরে / সেই কথাটি তুমি / ভুলবে কেমন করে / সেই কথাটি কবি / পড়বে তোমার মনে

বর্ষামুখর রাতি / ফাগুন সমীরণে / এইটুকু মোর শুধু / রইল অভিমান / ভুলতে সে কি পার / ভুলিয়েছ মোর প্রাণ / আমি তোমায় যত / শুনিয়েছিলেম গান / তার বদলে আমি / চাইনে কোন দান .. অতএব, ও মিষ্টি সোনা গো, ভুলতে আমায় পারবে না। এতদিন অভিমান ছিল, চাইব না কিছু। আজ বুঝতে পারি, যন্ত্র অন্য সুরে বাজছে· তোমার কাছে চাইবার লজ্জা আর নেই। যদি অবশ্য কোনদিন প্রত্যাখ্যাত হই, উপেক্ষিত হই, তখন পথপ্রান্তে পড়ে রব ধ্যানমগ্ন শিব হয়ে অবশ্য তার আগে সবদুঃখ জানাব, সব কথা মন খুলে বলব, না হলে তোর কান মলার সুযোগটা পাব কি করে? বরং, পাশরিব ভাবনা / পাশরিব যাতনা / রাখিব প্রমোদে ভরি / দিবানিশি মন-প্রাণ। আর গাইব, আন তবে বীণা, আন / সপ্তমসুরে বাঁধ তবে তান / ঢাল ঢাল শশধর / ঢাল ঢাল জোছনা / সমীরণ বহে যাবে / ফুলে ফুলে ঢলি ঢলি / উলসিত তটিনী / উথলিত গীতরবে / খুলে দেবে মন প্রাণ ······ আর তখনই, আবার জানলায় দাঁড়িয়ে শুক্লপক্ষের ধুয়ে যাওয়া সমুদ্রতটের ওপারে বেশী ব্রাইটনেসের টিভিতে ফেড্ আউট হয়ে আসা নীল রং, আরও আরও বেশী উজ্জ্বল সাদা ফেনা দেখব। কিংবা দেখব, কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে, শুধুই ব্রেকারের ভেঙে যাওয়া গাঢ় দুধ সাদা ফেনা। এখন হাজার প্রজাপতি আলোর স্রোতে পাল তুলেছে, মল্লিকা মালতী আলোর ঢেউয়ে নেচে উঠছে ; আর, আর ·····পাতায় পাতায় হাসি ও ভাই/ পুলক রাশি রাশি / সুরনদীর কুল ডুবেছে / সুধা নিঝর ঝরা। তাই এখন, বাজে আলো / বাজে ও ভাই / হৃদয়বীণার মাঝে / জাগে আকাশ, ছোটে বাতাস / হাসে সকল ধরা। নিজের মনের গভীরে প্রবেশ করে এখন অনেক কিছুই তুচ্ছ মনে হয়। অন্য পার্থিব দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়ে বলতে ইচ্ছে করে ; তোরা পাবার জিনিস, হাটে কিনিস/ রাখিস ঘরে ভরে / যাহা যায় না পাওয়া, তারি হাওয়া / লাগল কেন মোরে / আমার যা ছিল তা দিলেম কোথা / যা নেই তারি ঝোঁকে / আমার ফুরোয় পুঁজি / ভাসি বুঝি / মরি তাহার শোকে / ওরে, আছি সুখে, হাস্য মুখে / দুঃখ আমার নাই / আমি আপন মনে / মাঠে বনে / উধাও হয়ে ধাই ······সেই সাথে বলতে ইচ্ছে হয়, মনে মনে ঃ তোল মুখানি, তোল মুখানি / কুসুমকুঞ্জ কর আলা / বলি কিসের শরম এত সখী / কিসের শরম এত / সখী, পাতার মাঝারে, লুকায়ে মুখানি / কিসের শরম এত / হেরো, ঘুমায়ে পড়েছে ধরা / হেরো, ঘুমায় চন্দ্রতারা / প্রিয়ে, ঘুমায় দিকবালারা / প্রিয়ে, ঘুমায় জগৎ যত / সখী বলিতে

মনের কথা / বল, এমন সময় কোথা / প্রিয়ে তোল মুখানি / আছে গো আমার / প্রাণের কথা কত / আমি এমন সুধীর স্বরে / সখী কহিব তোমার কানে / প্রিয়ে, স্বপনের মত সেকথা আসিয়ে / পশিবে তোমার প্রাণে / তবে মুখানি তুলিয়া চাও / সুধীরে, মুখানি তুলিয়া চাও। নিজেকে ভরিয়ে রাখি সেই পরম দার্শনিকের আহ্বানে ঃ কর্মের কলরব ক্লান্ত / কর তব অন্তর শান্ত / চিত্ত আসন দাও মেলে / নাই যদি দরশন মেলে / আঁধারে মিলিবে তাঁর স্পর্শ / হর্ষে জাগায়ে দিবে প্রাণ / দিন যদি হল / হল অবসান / নিখিলের অন্তর / মন্দির প্রাঙ্গণে / ওই তব এল / এল আহ্বান ... আমি গান গাই, মনের সুরে নিজেকে রাঙিয়ে ফেলি সেই সুরের সাগরে ডুব দিতে দিতেও সুরের আরাধনা করি। নাই বা রইলো গলায় সুর, দেবী সরস্বতীর কৃপায় মনের মাঝারে সুর ধ্বনিত হয়, শুধু রিনিরিনি করে গলায় বাজে না। তাই তো সে অভাব মেটাতে তোমায় সাধি, গান শুনতে চাই। আমার নয়ন দুটি / শুধুই তোমারে চাহে / ব্যাথার বাদলে যায় ছেয়ে ; / বয়ে চলে আঁধি আর রাত্রি / আমি চলি দিশাহীন যাত্রি / দুর অজানার পারে / আকুল আশার খেয়া বেয়ে / আমার নয়ন দুটি—....কতকাল আর কতকাল / এই পথ চলা ওগো, চলবে / কত রাত্রি হিয়া / আকাশ প্রদীপ হয় জ্বলবে / কোন রাতে মনে কি গো পড়বে / ব্যথা হয়ে আঁখিজল ঝরবে / বাতাস আকুল হবে / তোমার নিশ্বাসটুকু পেয়ে / আকাশ প্রদীপ ... পৃথিবী থেকে কতটুকুই বা পাই ? তবু জানি মনে, একটুকু ছোঁয়া লাগে / একটুকু কথা শুনি/ তাই দিয়ে মনে মনে / রচি মম ফাল্গুনী / কিছু পলাশের নেশা / কিছু বা চাঁপায় মেশা / তাই দিয়ে সুরে সুরে / রঙে রসে জাল বুনি / রচি মম ......। যেটুকু কাছেতে আসে / ক্ষণিকের ফাঁকে ফাঁকে / চকিতে মনের / কোণে স্বপনের / ছবি আঁকে / যেটুকু যায়রে দূরে। ভাবনা কাঁপায় সুরে / তাই নিয়ে যায় বেলা / নূপুরের তাল গুনি / রচি মম কিছু চেনা জন্ম জন্মান্তরের। মনের মাঝারে তারই সুমধুর ধ্বনি ওঠে, তোমারে চিনি / দারুচিনির দেশে / তুমি বিদেশীনি / সুমন্দভাষিণী / প্রশান্ত সাগরে / তুফানে ও ঝড়ে / শুনেছি তোমারই অশান্ত রাগিণী / বাজাও কি বুনো সুর / পাহাড়ী বাঁশিতে / বনান্ত ছেয়ে যায় বাসন্তী হাসিতে / তব৹ করবী মূলে নব এলাচের ফুল / দুলে কুসুম বিলাসিনী।

কিংবা বলে উঠি; পুরানো সেই দিনের কথা / ভুলবি কিরে হায় / ও সেই চোখের দেখা, প্রাণের কথা / সে কি ভোলা যায় / আয় / আর একটিবার আয়রে সখা / প্রাণের মাঝে আয় / মোরা সুখের দুখের কথা কব / প্রাণ জুড়াবে

ভায় / মোরা ভোরের বেলায় ফুল তুলেছি / দুলেছি দোলায় / বাজিয়ে বাঁশি / গান গেয়েছি / বকুলের তলায় / পুরানো । হায়! মাঝে হল ছাড়াছাড়ি / গেলেম কে কোথায় / আবার দেখা যদি হল সখা/ প্রাণের মাঝে আয় / পুরানো সেই

প্রতীক্ষা প্রতীক্ষা অনন্ত

হে অভিসারিকা, তব বহুদূর পদধ্বনি লাগি
আপনার মনে
বাণীহীন প্রতীক্ষায় আমি আজ একা বসে জাগি
নির্জন প্রাঙ্গণে
দীপ চাহে তব শিখা মৌনী বীণা ধেয়ায় তোমার
অঙ্গুলিপরশ—
তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার
সঙ্গসুধারস ॥
নিদ্রাহীন বেদনায় ভাবি কবে আসিবে পরাণে
চরম আহ্বান।
মনে জানি, এ জীবনে সাঙ্গ হয় নাই পূর্ণ-তানে
মোর শেষ গান।
কোথা তুমি, শেষবার যে ছোঁওয়াবে তব স্পর্শমণি
আমার সংগীতে?
মহানিস্তব্ধের প্রান্তে, কোথা বসে রয়েছ, রমণী
নীরব নিশীথে?

এই ছিল খোঁজা, এই ছিল চাওয়া। খোঁজার উত্তর মিলেছে। তোমার বাণী / মর্মতলে যায় হানি, সংগোপনে / ধৈরজ যায় যে টুটে / যেমন বর্ষাধারায়/ অরণ্য আপনা হারায় / বারেবারে / ঘন রস আবরণে / তেমনি তোমার স্মৃতি / ঢেকে ফেলে মোর গীতি / নিবিড় ধারে / আনন্দ বরিষণে ··

অধ্যায়—৮

দুই আদি একত্র হলে তবেই অনাদি-র স্পর্শ পাওয়া যায়। আদরের সময় এক সুতোর বাধাকেও সহ্য হয় না। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার জানো, খুব ভালো লাগে, আলতো করে একটু একটু করে খোসা ছড়িয়ে চাখতে, স্বাদ নিতে। স্বাদ নিতে নিতে ক্রমশ পুরো মজ্জা, আঁটি খাওয়া হয়। কিন্তু এতো মহাফল,

তাই একবার খেয়ে আশ মেটে না। বরং বারবার খেয়ে আরও অমৃত পান করে অমৃতস্য পুত্রা হতে ইচ্ছে করে, সাধ হয়। আর যখন স্নান করি পূর্ণকুম্ভে আ-শরীর, আ-দিগন্ত তখন কুম্ভকে চির অজানা মনে হয়, আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের গুণে যা-খুশী পাবার রহস্য সত্য বলেই ধারণা হয়। হ্যাঁ গো, দারুণ একটা রহস্য আছে. ডিটেক্‌টিভ গল্পের রহস্য রোমাঞ্চ নয়। সুখানুভূতির রহস্য, আশ্চর্য প্রাপ্তির রোমাঞ্চ। গায়ে শিহরণ জাগে, রোমাঞ্চ পেলে অন্যত্রও বিস্তৃত হয় সে শিহরণ আর মুক্তির আনন্দে শরীরের স্বেদবহ শিথিলতা মুহূর্তে পরমকাম্য ধন পাইয়ে দেয়। এ সেই, সন্ন্যাসীঠাকুরের পরশপাথর পাওয়া। পরশ পাথর কি সত্যিই আছে, আছে কি বাঞ্ছাকল্পতরু অথবা কামধেনু? কিংবা গুপী-বাঘার ভূতের রাজা? চাইলেই যা খুশি পেয়ে যাবে, যেখানে খুশী বেড়াতে পারবে, যা খুশি তা-ই গাইতে পারবে। খাওয়া ঘুমোনো-বেড়ানো গান গাওয়া—আর কি চাই জীবনে? এই ইন্দ্রিয়তৃপ্তি থাকলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়-গুলোর কথা ভুলে যাওয়া যায়। এই-ই চরম আনন্দ, আনন্দের আন্তর রূপ, এই মোক্ষ, এই নির্বাণ, এই শান্তি, এই ব্রহ্ম, এই ওঁং। চিন্তা বিরহিত, হিংসা-দ্বেষ ঈর্ষা বর্জিত এই আনন্দ যে পায় সেই তো চিদানন্দ, মহাপুরুষ। আমরা মহাপুরুষ হতে পারিনি বলে, নির্দ্বিধায় এই আনন্দ ভোগ করতে পারি-না—তাই আমরা শুধুমাত্র মানুষ হয়েই বেঁচে থাকি। তবে জানো তো, মানুষের মত বেঁচে থাকারও অন্য একরকম আনন্দ আছে। এতে থাকে জয়, সীমিত হলেও, স্বল্প হলেও বাধা টপকাতে পারার আনন্দ। তাই মনুষ্য জন্মেও দুঃখ নেই। আপ্তবাক্য। ঈশ্বরের জায়গায় আমার স্থান হয়নি বলেই মনুষ্যলোকে আমার আবির্ভাব। অবশ্য স্বেচ্ছা আবির্ভাবের প্রসঙ্গ এখানে বাদ দিলাম। মনুষ্যক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করে মনুষ্যের দোষ-গুণ সুখ-দুঃখ নিয়েই বাঁচতে হবে। তবে, আবার তবে, দোষ-গুনের সীমারেখাও মনুষ্য নির্ধারিত আর সুখ-দুঃখও মনুষ্যের আপন কল্পনা। কাজেই মন, নিজেকে নিজে বিচার কর। তাই তোমার, তাই আমার, তাই মনুষ্যনামধারী সকলের অন্তরের মানুষ—যে বিবেক। অর্ধেক জীবন খুঁজি, কোনক্ষণে চক্ষু বুঁজি, স্পর্শ লভেছিল যার এক পলভর, বাকি অর্ধভগ্ন প্রাণ, আবার করিতে দান—ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ পাথর।

লোকে বলে, সবতীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার। বাবা বিশ্বনাথের পীঠস্থানের ক্ষেত্রেও সেই একই আপ্তবাক্য প্রযোজ্য কি না জানি না, তবে সময়ের বিবর্তনে গঙ্গাসাগর ভ্রমণের কষ্টও এখন আর নেই। তাই গঙ্গাসাগর যাওয়াও বারবার হয়। বেনারস বা কাশীর ক্ষেত্রে এমন বাক্যটি শুনে না

থাকলেও এভাবে ঘোরা যেন জীবনে একবারই হয়। বেনারস ভ্রমণ, বিশ্বনাথ দর্শন বারে বারে কাম্য ঠিকই, কিন্তু যে কঠিন অগ্নিপরীক্ষা, তা কি লোকে বার বার কামনা করে? আরে, সীতা-র মতো দৈবনারীও অগ্নিপরীক্ষা দুবার দিতে চ নিনি, আর কুতো মনুষ্যা? হাজার হোক আগুনের উপর দিয়ে খালি পায়ে হাঁটা তো! ধৈর্য্যের পরীক্ষা, ত্যাগের পরীক্ষা, তিতিক্ষার পরীক্ষা আমার কোন আপত্তি নেই কেননা মনে হয় তাতে উত্তীর্ণ হতে আটকাবে না। কিন্তু আগুন নিয়ে খেলা! রোমাঞ্চকর নিঃসন্দেহে, উত্তীর্ণ হয়ে গেলে পৌরুষের জয়, কিন্তু সাফল্য আর অসাফল্যের মাঝখানে যখন প্রায় কোন রেখার আকার নেই, আছে শুধু একটা সরু সুতোর ব্যবধান, তখন ভয় করে বই কি! অনুত্তীর্ণ হওয়া মানে তো এখানে সার্কাসের মত নিজেকে হারানো নয়, হারানো অপরপক্ষকে, তাই ভয়।

তেমনি মনে পড়ে গয়া জেলায় হাইওয়ের উপর দিয়ে ছোটবার সময়, যেখানে বিন্ধ্যের ভগ্ন বুদ্বুদ ছোটনাগপুরের আর সব ভাঙা বুদবুদের পাশে ছোট সেলাইয়ের মত জোড়া লেগেছে, যেখানে পাহাড়ের নীচে তরাই নয়, শুষ্ক বনাঞ্চল তৈরী করেছে, সেখানে বসন্ত কেমন ভাবে এসেছিল—এপাশে তাকাও, ওপাশে তাকাও এমন কি পেছন ফিরেও হাঁ করে সুন্দরীর সৌন্দর্য্য দেখ বসন্তও লাল হয়ে সে তোমায় ডাকবে– রুজের লাল নয় যে ঘামে উঠে যাবে, চোখের জলে ধুয়ে যাবে, লিপষ্টিকের লাল নয় যে দিনের ক্লান্তির পর আবার লাগানোর প্রয়োজন পড়বে কিংবা প্রেমিকের পেষণে তা প্রেমিকেরই ভোগে ধুয়ে-মুছে যাবে। এ লাল সে লাল নয়, বসন্তের বাসন্তী মেশানো লাল। রূপ টানে, এ রূপও মোহে ফেলে। মনে হয় না, সামনে এখনো অনন্ত পথ। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে, লতাগুল্ম ঠেলে বুনো পাহাড়ের বুনো সৌন্দর্য্য। অভাব রয়ে গেল, সাঁওতালীর সাজ নয়নভরে দেখা হলো না। আদিম বৃক্ষের আহ্বান উপেক্ষা করে সময়ের সাথে পাল্লা দিতে হলো। রঙীন কণা মেশানো সিলভার নাইট্রেট অছ্যুৎ রয়ে গেলো, ধরে রাখতে পারলো না, আদিমতার মাঝে চির আদিম তোমার সৌন্দর্য্যকে। হয়তো পরের জন্য, অনাগত দিনের জন্যে তোলা রইলো সে আস্বাদ। সেই যে, সাহিত্যিকের ভাষায় বলে না, মরুভূমির মরীচিকা, কিংবা অন্ধকার ভূত-ঘুরে বেড়ানো বাগানে আলেয়ার আলো। যা সামনে দেখি, তা আমার নয়, তা সত্য নয়, তা আসলে অনেক দূর। এই মরীচিকা, এই আলেয়া প্রকল্পিত সুখ,—তোমার, আমার, দুজনের। কিন্তু, মরীচিকা বা আলেয়া প্রকৃত অর্থে জল বা আলো

না হলেও পিছনে একটা সত্যি আছেই। মরীচিকা কেন হয়? তাপমাত্রার পরিবর্তনে আবহাওয়ার বিভিন্ন স্তরে প্রতিসরাঙ্কের পরিবর্তনের জন্যে আলোকরশ্মির গতিপথের পরিবর্তন, তারপর পূর্ণ প্রতিফলন, ইত্যাদি ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, এসব তো আছেই। আর আলেয়া? সেই যে গো, নতুন নতুন জৈব রসায়ন শেখবার সময় জেনে উৎফুল্ল হয়েছিলাম, নিঝুম রাতে ভূতের বাসস্থানে জমে থাকা মিথেন গ্যাস বিভিন্ন সব প্রাকৃতিক কারণে নিজেই দাহ্য হয়ে আলো হয়ে ফুটে ওঠে। পার্থিব আরও কয়েকটি উপকরণের মত সত্য হল আলো, সত্য বায়ু, সত্য জল, সত্য শব্দ, সত্য মৃত্তিকা। সেই একই সমীকরণে মানসিক উপাদানে সমৃদ্ধ হয়ে সত্য হল শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা। 'মরে না, মরে না কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর বিস্মৃতির তলে। নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির, আঘাতে না টলে।' তাই সুখের আশা যতই ক্ষীণ হোক না কেন, ভালবাসাটাকে সত্য বলেই জানি, তারই ধুনির আগুন বুকের পরতে পরতে লেগে থাকে ক্ষীরের প্রলেপের মত, সরের আস্তরণের মত, বুকের উপর দাঁতের কামড়ের মত নগ্ন সৌন্দর্য্যের উপর আপন শরীরের জমানো সৃষ্টিরস ফেলে চলে চিত্রণের মত, বন্ধ ঘরে জমিয়ে রাখা ধোঁয়ার মত। এটুকু থাকবে, কেননা এ চিরসত্য। পার্থিব আঘাতে এ ভেঙে পড়বে না—কেননা এ কোন দ্রব্য নয়, চোখের জলে এ দ্রবীভূত হবে না কারণ মহার্ঘ ধাতুর মতই এ কঠিন, অদ্রাব্য। তাই পিরিয়ডিক টেবলে এর স্থান নেই। না থাকুক। থাকে না বলেই তো তাকে শ্রদ্ধা করি, ঠাঁই দিই সবার উপরে। ওগো মেয়ে, সেই মোর দান, সেই মোর প্রাণ, সেই মোর গান। এ গানে সুর দিই নিজে, তাল দাও তুমি, লয় বজায় রাখে দুজনের মিলিত প্রয়াস। এ spmphony, এ harmonic, orchestra. একটা যন্ত্রও নিজস্ব সমন্বিত রাশ বজায় রাখতে না পারলেই মুখ ভার, ছন্দপতন। আবার যন্ত্রের কানটা দাও মুচড়ে, তবলায় হাতুড়ি ঠুকে 'সা'-এর সাথে মিলিয়ে নাও—দেখবে সুর আর সুর। সুরের অভিনবত্বে নাকি ফুল গান গায়, আবাশে অসময়েও বৃষ্টি নামানো যায়, বসন্ত শেষেও দূরবর্তী কোকিলকে টেনে এনে বাধ্য করা যায় গান গাইতে। গল্প কথা, হবেও বা। হলেও আপত্তি নেই। সত্যিই বৃষ্টি ঝরবে কিনা জানি না, কুহু রব অসময়ে মন মাতাল করবে কি-না জানি না, তবে এটা নিশ্চয়ই হবে, সেই আচ্ছন্নতা, সেই ঘোর, সেই বিস্ময়, সেই তৃপ্তি—যা নাকি, আধো অন্ধকারে আধি দৈবিক, আধি-ভৌতিক (Mystic)?—রূপ এনে দেয় আমার মুখে—এক ভয়ংকর সুন্দর বিস্ময় আর তৃপ্তি গা জড়াজড়ি করে ধরা দেয়। তোমার গ্রীবার সঞ্চালনে, তোমার নাকের আস্ফালনের, ঠোঁটের বিচিত্র ভাষায় আর

সেইসাথে ছবির মতো সুন্দর হয়ে বাঁ হাতের কনুই এর নেমে আসা পূর্ণভাবে আলিঙ্গন করে আমার গলা থেকে উপরের সব অংশটা। এই সুর, এই সাধনা, এই সুখ। আহারে, সেই শচীন দেব বর্মণের (সাহেবী কেতায়, এস ডি. বর্মণ) বিখ্যাত কলি, মুকুতা যেমন শুকতির বুকে,—তেমনি তোমাতে আমি—মনে পড়ে যায়। বড় ভাল তুলনা। মুক্তো নয়, মুক্তা নয়,—এ হলো গিয়ে মুকুতা ; ঝিনুক নয়, শুক্তি নয়, শুকুতো—বড় ভাল ছন্দ, একটা আলোড়ন, একটা গা জড়ানো ভাব, কাঁঠালের আঠা নয়, চ্যাটচেটে ভাব নয়—পুরো গলাগলি, কিংবা কোলাকুলি। আচ্ছা, কোলাকুলি-র সন্ধি কি? অথবা ব্যাসবাক্য? কোলের জন্যে আকুলি, না কি, কোলের সাথে কোল? জানিনা বাপু এতশত বক্তিমে। ডক্টরেটের জন্যে থিসিস্ লিখতে বসিনি। তাই তথ্যে ভুল থাকলেও ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। আমি বকি, তুমি শোন। তুমি বক, আমি শুনি। শুনি বলেই কানের মূল্য, আর শুনি বলেই তোমার বলার সার্থকতা, তুমি শোন বলেই আমার বলার তৃপ্তি। এ সেই একই কথা—প্রেরণ আর গ্রহণ। রামনগরের রাজা মহল ভরে সাজিয়ে রাখলেন ঘোড়ার গাড়ি, জুড়ি গাড়ি—এক ঘোড়ার দু-ঘোড়ার, চার ঘোড়ার। আর রইল কামান, তরোয়াল, বন্দুক, শিরস্ত্রাণ আরও কত কি। রাজার পোষাক, রাণীর পোষাক বাহারী হয়ে ঝোলে, সাজে রাজার মুকুট, রাণীর মুকুট। আরও কত না দেখন-বাহার জিনিষ,— হাতীর হাওদা, একই ভঙ্গিমায়—সেই সূর্যিমামার পূর্বে আরোহণে, পশ্চিমে অবরোহণে। মাঝবেলায় ছায়া নেই। কি চমৎকার! আলো আছে, বস্তু আছে, ছায়া নেই। কি করে হল, এরও আবিষ্কারের এক চমৎকার গল্প আছে। এক সেয়ানা (খারাপ বা নিম্নগা অর্থে নয়) পাগল লোক দুপুরে মেঠো রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিজের ছায়া দেখতে দেখতে হাঁটছিল। ভূত শুধু প্রাচ্যে নয়, প্রতীচ্যেও আছে। ধু ধু মাঠের মাঝে হঠাৎই দেখতে পেল সে, ছায়া ছোট হচ্ছে। প্রথমে ভাবল, চোখের ভুল, এদিকে ঘুরে, ও দিকে দৌড়ে যতই নিশ্চিন্ত হওয়ার চেষ্টা করে, না, না ছায়া ছোট হয়ে যাবে কি করে, ততই অবাক বিস্ময়ে দেখে, না, ছায়া তো সত্যিই ছোট হয়ে যাচ্ছে। আরও এগোতে লাগল। মনে ভয়, তাহলে কি হল, সত্যি ই কি লোকে যা বলে, এখানে অশরীরীরা ঘোরে তাই ঠিক? কি করে মেনে নেওয়া যায় একথা? উল্টোটা গ্রামের লোকদের বোঝানোর জন্যে কি আপ্রাণ প্রচেষ্টাই না তিনি করে এসেছেন এতদিন এবং এখনও করে যাচ্ছেন। তবে কি সাধারণ লোকদের বিশ্বাসই ঠিক আর তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার, তাঁর

বোঝা তুচ্ছ ? যাই হোক, মনের সব শক্তি জড়ো করে এগোতে লাগলেন, মাথায় ঘুরতে লাগল, অপমানের জ্বালা। কিন্তু একটু পরেই নিজের শাশ্বত বিদ্যা, বুদ্ধি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। হতে পারে না, শরীরীকে বাদ দিয়ে অশরীরী প্রভাব। কার্য্যের পিছনে কারণ থাকবেই। সেই কারণই তাঁকে বার করতে হবে। কঠিন জেদ। মানুষকে জিততেই হবে, উঠতে হবে সব কুসংস্কারের উপরে, মনে উচ্চাশা, জীবনে কিছু পথ যদি উত্তরসূরীদের জন্যে দিয়ে যেতে পারেন। এগোতে এগোতে চলতে লাগল পর্যবেক্ষণ, ঘড়ি ধরে। প্রতি পনের মিনিট পর পর মাপতে লাগলেন ছায়ার দৈর্ঘের হ্রস্বতা। কোন স্কেল দিয়ে নয়, কুড়িয়ে নেওয়া গাছের সরু ডাল দিয়ে। এ-ও সেই. আমাদের বাংলাদেশের গাঁয়ে গঞ্জের ডাল-ভাঙা ক্রোশের মতো। ডাল ভাঙা ক্রোশ জানো ? দু মাইল (আগেকার দিনের দূরত্বের মাপ) মানে এক ক্রোশ। গ্রামের দিকের লোকের মধ্যে ঘড়ির প্রচলনও এখন থাকলেও, শ'খানেক বছর আগেও তা ছিল না, ছিল না গজ ফিতের প্রচলনও। লোকে দূরত্ব মাপত এক অদ্ভুত পদ্ধতিতে। কচি শিশু গাছের ছোট ডাল ভেঙে নিয়ে সকালে চলা শুরু হত—যখন সেই ডালটা পুরোটা শুকিয়ে যেত, সেই দূরত্বকেই বলা হত এক ক্রোশ। স্বভাবতই অনেকগুলো উৎপাদকের উপর নির্ভরশীল হতে হত সেই পদ্ধতিকে—যেমন ডালের দৈর্ঘ নির্দিষ্ট হতে হবে, রোদ কম বেশী হওয়া চলবে না, প্রত্যেককে একই গতিতে পথের একই condition-এ হাঁটতে হবে। অতএব, মাপ বদলাতো, গ্রামের দিকে 'ঐ যে হোথা'—শুনে হাঁটতে গেলে তুমি শহুরে মানুষ মরেছ আর কি। তো সে যাই হোক, প্রতীচ্যের সেই পঞ্চাশোর্দ্ধ ব্যক্তিটি তো ছায়ার সাথে পাল্লা দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। একটু পরেই ছায়া কমতে কমতে শূন্যে পৌঁছল। ঘাবড়ালেন না বিদগ্ধ জ্ঞানপিপাসু। শূন্য তো এল। এবার বাপু, পালাও কোথা ? শিহরিত হলেন, রোমাঞ্চ তাঁকে ঘিরে ধরল। তার পনের মিনিট পরেই তিনি নতুন কিছু একটা পেয়ে যাবেন। হয় অঙ্ক শাস্ত্র নতুন করে লিখতে হবে, শূন্যের পর শুধু ঋণাত্মক চিহ্ন দিয়ে দায় সারলে চলবে না, আর না হয় সূর্যের গতিবিধির সাথে ছায়ার দৈর্ঘ্যের কিছু সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। আর না হয় শরীরী অশরীর সম্পর্ক সূত্র কিছু পেয়ে যাবেন। গভীর মনোনিবেশ দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন। অবাক কাণ্ড, এবার 'ইউরেকা' নয়—তবে চীৎকার বেরিয়ে এলো, উল্লম্ফনের সাথে. আবার ছায়া ফিরে এসেছে, সেই দৈর্ঘ্যে, পনের মিনিট আগে যে দৈর্ঘ্যে দাঁড়িয়েছিল তাতে। তারপরের গল্প, সহজ গণিতশাস্ত্র। সম্ভাবনা নয়,

বিশুদ্ধ গণিত। পনের মিনিট পরে ছায়া ঠিক আগে পাওয়া দৈর্ঘ্যগুলোতেই পৌঁছচ্ছে। পাগল হয়ে গেলেন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিটি। কিন্তু, হারিয়ে ফেললেন না নিজেকে। পরের দিন গাঁয়ের আরও গুটিকয় লোককে নিয়ে, কয়েকটা ঘোড়া, গাধা এসব সাথে নিয়ে চলতে লাগলেন, কাক-ভাঙা ভোরে। কোঁচড়ে বাঁধা, খুড়ি, পকেটে নেওয়া হল কিছু বিস্কুট আর রুটি। ছায়ার প্রথম আবির্ভাবের সময় note করে প্রতি পনের মিনিট পর পর চলতে লাগল, অশরীরীরা চলে বেড়ানো মাঠে এক অদমিত ব্যক্তিত্বের বিজ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ। অঙ্কের ফল মিলিয়ে দেখা গেল, ঠিক বারটা বাজা পর্যন্ত ছায়ার দৈর্ঘ্য বেড়ে-কমে সেখানেই পৌঁছোল। অর্থাৎ, কিনা সমানুপতিক হার। অঙ্কশাস্ত্র নতুন করে লেখা হল না, শূন্য অবিকৃতই রইল—যোগ হল অনুপাতের সূত্র, আবিষ্কৃত হল আলোকশাস্ত্র ইংরেজিতে Optics। ছায়া হারিয়ে যায় নি, কোন আশরীরী আত্মা তাকে গ্রাস করেনি, শুধু আলোর উৎস, বস্তু, ছায়া একই সরলরেখায় মিলে মিশে গেছে। তাই, ছায়া বস্তুতে লীন (latent বা absorbed) হয়ে গেছে। এই হল গিয়ে গল্প। এবার বল তো, সেই চুলে পাক ধরা লোকটি কে? তিঁনি আলোকশাস্ত্রের জন্মদাতা। বিজ্ঞানীদের একটা মজা আছে। পর্যবেক্ষণ, তত্ত্ব নীতি—এরপর শুরু হয়ে যায় প্রয়োগ। ইঁনি প্রয়োগের ধাপে জানাশোনা অঙ্কশাস্ত্র চাপাতে চাপাতে পৌঁছে গেলেন, আলোর কণা তত্ত্বে—অঙ্ক প্রয়োগ করে চললেন নীল আকাশে দিনে রাতে দেখা বিভিন্ন জিনিষের চলাচলের উপর। ক্রমে ক্রমে তৈরী হল, তত্ত্বগত আর এক শাস্ত্র-জ্যোতির্বিদ্যা (Asronomy)। একে প্রয়োগ করে পরে জ্যোতিবিদ্যা (Astrology)।

অধ্যায়—৯

তা এই ছায়ার দিনও এসেছিল রামনগরের রাজবাড়িতে। সূর্য ওঠে বটে, বিকেল হলে তার লাল অস্তরাগও ছড়িয়ে দেয়, রাজবাড়ীর পেছনে বয়ে যাওয়া পূণ্যতোয়া গঙ্গার মৃদু তুলুনিতে। কিএক অজানা শিহরণ, হিমালয় থেকে কি দূরেয় সাগর থেকে বয়ে আসা হাওয়া যেন কি এক অজানা দিনের ইঙ্গিত দেয়। এই ইঙ্গিত পেয়েছিলেন নবাব আলিবর্দী, পেয়েছিলেন সিরাজ, মীরকাশিম ঝাঁসির রাণী, বাজীরাও, তাঁতিয়া টোপে, গজলের রসে ডুবে থাকা, মুক্ত বিহঙ্গের সাথে উড়তে চাওয়া নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ। শাজাহানের দরবারে পশ্চিমী চিকিৎসার ভেলকি দেখানো ডাক্তার সাহেব ততদিনে বোধহয় বুঝে গেছেন, তাঁর ভবিষ্যত প্রজাতির জন্য কি মধুক্ষরা দিনের তিঁনি ভিত

গড়ে তুলেছিলেন, হয়তো বা নিজেরই অজান্তে। রামনগরের রাজাও পেয়েছিলেন হাওয়ার কাঁপুনি। হাওয়ায় তখন বারুদের গন্ধ একটু একটু করে ভেসে উঠছে। উত্তর পশ্চিম কোণের আকাশে কালো মেঘ ঝড়ের ইঙ্গিত। সেই মেঘও দেখতে পেয়েছিলেন রামনগরের শেষ রাজার (মানে প্রিভি পার্স বিলোপেরও আগে, ভারতবর্ষ প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষিত হওয়ার পর সরকারের ডাকে সাড়া দিয়ে যাঁরা 'রাজা' খেতাব পরিত্যাগ না করলেও ভারতবর্ষ নামক দেশটির মধ্যে নিজেদের রাজত্বের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে যাঁরা আপত্তি করেন নি, তাঁদেরই একজন) পূর্বপুরুষ। কাশীর হিন্দু রাজা নামেই বিখ্যাত ছিলেন তিনি ও তাঁর রাজবংশ। এর অল্প কিছুদিন আগেই হিন্দু উত্তরাধিকারিত্বের অপব্যাখ্যা করে বৃটেনের রাণীর নামে ফরমান জারি হয়েছিল, বিবাহিত পত্নীর গর্ভে সন্তান না থাকলে অন্য রাণীর গর্ভজাত সন্তানের, বা রাণীর রাজত্বে উত্তরাধিকার বৃটিশ, সরকার মানবেন না। 'তাঁরা নন, শুধু রাণী পেতে পারবেন ভাতা। রাণীত্ব তো নয়ই, শুধুমাত্র ভাতা। এতো গেল অজুহাত মাত্র, আসল উদ্দেশ্যের পথে এ তো একটা ধাপ মাত্র। কিন্তু যাই বল, কঠিন ভিত্তি। শুধু এই ভিত্তির উপর ভরসা করেই ইংরেজদের পুরো ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতা আক্ষরিক অর্থে নিজেদের হাতে নিয়ে নেওয়ার কাজটা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কোপ তো কারুর না কারুর উপর প্রথম পড়বেই, কবিরাজার দুর্ভাগ্য, তাঁকেই হতে হল প্রথম বলি। অযোধ্যা-নামক প্রিয় রাজ্যের প্রজাদের ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়ে মন নিংড়ে বার করা বোল দিয়ে গজলের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে তাঞ্জামে চড়লেন সৌখীন নবাব। শেষ হয়ে গেল, এক বনেদী সংস্কৃতির অগ্রগতি। রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে, সমাজজীবন বদলের ধাঁচে যাঁরা অন্তসুরে দীক্ষিত, তাঁরা হয়তো বা বলবেন, Collapse of a rotten edifice। ঘটনা এক, ব্যাখ্যা আলাদা। তাই অযোধ্যার নবাবের করুণ বিদায়ে দুঃখিত হলেন মুক্তিকামী মানুষ, যাঁরা মানুষের মনের মুক্তিকেই উত্তরণের সোপান বলে মনে করেন, সমব্যথী হলেন অন্যান্য অনেক রাজা নিজেদেরও অনুরূপ দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে, নবজাগরণের সূত্রধর ভারতীয় পুরুষরা ভাবলেন, আগ্রাসন এবার পুরোপুরি হল যা জনগণকে সংহত হতে সাহায্য করবে, আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সার্থক (?) না হলেও কয়েক শতাব্দী আগের কল্পলোকের শিশু—যা রাজন্য প্রথা, সামন্ত প্রথা বিরোধী জনগণের সরকার গঠনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, ভারতবর্ষে ভ্রূণস্থ হল। অযোধ্যা থেকে কলকাতা পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ পথ অযোধ্যার নবাবের জীবনে আক্ষরিক অর্থেই হয়েছিল মহাপ্রস্থানের পথ। কলকাতা থেকে আর নিজের রাজত্বে ফিরে

যেতে পারেন নি কোনদিন। না চাইলেও ভাগ্যচক্রে সিপাহী বিদ্রোহের রূপকারদের অজ্ঞাতবাসের সময়ে বিপ্লবীদের স্ব-প্রযুক্ত ধ্যান ধারণায় নেতৃত্ব দিতে হয়েছিল ওয়াজেদ আলিকে। আর সেই সন্দেহে, সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে ফোর্ট উইলিয়ামের বৃটিশ সৈন্যদের নজরদারিতে দীর্ঘ সময় ভারতবর্ষের প্রথম রাজবন্দী হিসেবে থাকতে হয়েছিল, একদা নবাবকে। এখান থেকেই বৃটেনের আদালতে লড়েছেন তিনি. নিম্ন আদালতে হেরে উচ্চ আদালতে জিতলেও ততদিনে নবাবী শরীর আর নেই। তাঁর মৃতদেহ আত্মীয় স্বজনের হাতে তুলে দেওয়াও হয়নি. স্বাধীন ভারতবর্ষে খুঁজে পেতে বার করা হয়েছিল ধূলি-মলিন কবরটুকু। এ এক অধ্যায় গেছে ভারতবর্ষে। রামনগরের রাজা বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁর অনেকগুণের জন্যে, যার মধ্যে একটা বড়গুণ হয়েছিল ওয়াজেদকে তাঁর আতিথ্য দান। রামনগরের রাজা চেষ্টা করেছিলেন তাঁকে কাশীতে রাখার, আর তাঁকে কেন্দ্র করে ইংরেজের বিরুদ্ধে 'অস্ত্র' ধারণের প্রচেষ্টা করার। সফল হয়নি তাঁর প্রচেষ্টা কিন্তু শান দিয়েছিলেন নতুন নতুন অস্ত্রে। অনেক অনেক মজার গল্প আছে এই অধ্যায়ের। কিছু বীরত্বের কিছু সাহসিকতার, কিছু বা রোমান্সের আবার কিছু বা একান্তই চোখের জলের। একটানা না লিখলে সুরে কেটে যায়। আমারও তাই হচ্ছে! কিছুতেই একসাথে অনেকটা লিখে উঠতে পারছি না। তবে, অগত্যা। গতি যার নেই, সে অগতি। কথায় বলে, অগতির গতি। অর্থাৎ কিনা, অগতিরও গতি থাকে—অন্তত গতি খোঁজার চেষ্টা করতে হয়। আমার অবস্থাও তাই। উর্দ্ধতনের হাজারবার ডাক, হাজার গণ্ডা অফিসারের খোঁজ এবং তদ্বির আর জনগণের তদ্বিরের চাপে সামনে খাতা খোলার অভ্যেস করে ফেলেছি। লোকে মানে ব্যবসায়ীরা বছরের প্রথমে হিসেবের খাতা খোলে, ছাত্র ছাত্রীরা বছরের প্রথমে নতুন খাতা শুরু করে। শুভ উদ্বোধন আর কি। আমার উদ্বোধনও নেই, তাই বোধনও নেই। এখাতা সব সময় খোলা। বছর দেড়েক আগে শুরু করেছিলাম, একটা ফুলস্ক্যাপ কাগজ, স্যরি, দুটো কাগজ, আর একটা ডট্ পেন নিয়ে। মনে মনে অনেক দিনই ইচ্ছে হত, কিছু লিখি। এতো ছেলেবেলার ইংরাজীর বা বাংলার বা অঙ্কের শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যে লেখা নয়, অতএব, সাপ ব্যাঙ ভাবার দরকার কি। না ভেবে লিখলেই তো হয়, অন্তত শুরু করলে। তবু হয়ে ওঠেনি। একটা না একটা কাজের চাপ, দীর্ঘ যাতায়াত, সমস্যার গুরুভার অথবা চেয়ারের গুরুদায়িত্ব—এরকম একটা না একটা বাহানা মানসিক স্তরে প্রায় সময়েই জড়িয়ে গেছে। অতএব, শুভারম্ভ আর হয় না, – বাংলা সিনেমা তো—হল পায় না—না কি, চেন নেই।

সমস্যা সেই শৃঙ্খলের। শৃঙ্খলাবদ্ধ মানুষের না কি মুক্তি নেই। বাস্তবে তাই-ই। ছায়াছবি-র বেলায় আলাদা। এদের আবার শৃঙ্খলেই মুক্তি। লেখার বেলায় দুই-ই আছে। থাকতে হবে শৃঙ্খল আবার কাটতেও হবে শৃঙ্খল। লেখার কালি, কাগজের পাতা, মনের নিরুদ্বিগ্নতা-র যথাযথ সংযোগ না ঘটলে অক্ষরের আকারে লেখা বেরোবে না। আবার ধরাবাঁধা গতের মধ্যে লিখেছ কি, সে লেখা আলু-কপি-সিম-টম্যাটোর কড়চা হবে। পয়সা আসবে তাতে ঠিকই, কিন্তু মনের খোরাক মিটবে না। অতএব শৃঙ্খলাব কঠোরতা চলবে না। এসব করতে করতে, মানে ভাবতে ভাবতে-দিন চলে যায়। লেখা আর হয় না। একরকম জোর করেই একদিন বসে গেলাম সরঞ্জাম নিয়ে। তবে দায়িত্ব নিজের থাকলেও, তাগিদ থাকলেও, অনুঘটক প্রয়োজন হয় কিছু কিছু রাসায়নিক পদ্ধতির জন্যে। অস্বীকার করব না এতদিন বুঝতে পারিনি, কিছু একটা অনুঘটক আমার এই লেখা শুরু করার জন্যে প্রয়োজন ছিল। বসে পড়ি কাগজ নিয়ে, কলম নিয়ে—কখনও বা লাল কালি, কখনও নীল, কখনও বা সবুজ-আবার কখনও শুধুই পেনসিল, কাটার আর ইরেজার। কি লিখব তা ভাবি না, কিসে লিখব তা তো নয়ই। কিন্তু সরঞ্জাম নিয়ে বসলে কখনও ভাবতে হয় নি, ভাবতে হয় না –লিখে যাই যা হোক কিছু। এই ভাবের প্রকাশ আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, সাহায্য করেছে নিজের জমে থাকা কথা পরপর বলে যেতে - তবে কখনও সাজিয়ে নয়, গুছিয়েও নয়। ভালো মন্দ বুঝি না জানি না, শুধু তোমারে জানি, তোমারে জানি, হে সুন্দর। ... । তো সেই গল্পটা বলছিলাম. রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। এ আবার এক রাজার সাথে আর এক রাজার যুদ্ধ নয়। একদিকে একটা রাজশক্তি, যে রাজার রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না—দিনে বা রাতে। পূবে কি পশ্চিমে, সূর্য উদিত হন। এ গোলার্দ্ধে অস্ত যায় তো অন্য গোলার্দ্ধে তাঁর উদয়। এহেন রাজাকে ইচ্ছে করলে রাত দেখতে হয় না। পৃথিবীর গোলকের একদিকের লোকেরা সকালে উঠে দাঁত মাজতে যাচ্ছে তো অন্য অর্দ্ধের লোকেরা গুড নাইট বলছে কিংবা নাইট ক্লাবে উৎসবে মত্ত। কাজেই এ যে সে রাজা নয়। রাজার, রাজা মহারাজা—প্রাচ্যের সম্রাট নন, পাশ্চাত্যের নাম করণে, King, Queen, Crown, coronation. প্রাচ্যের হা-মুখ্যু লোকগুলো রাজাকে বলতে শিখল King, রাণীকে Queen, মুকুটকে Crown, অভিষেককে Coronation আ মরি, ভাষার কি বাহার, কিংবা তার মাধুর্য। তা পূব দিকের সেই উলু-খাগড়ারাও তাই বলে ফেলনা-র সামগ্রী ছিল না। তাঁদের রাজা ছিল, সম্রাট ছিল, জমিদার ছিল, রাণী ছিল, রাজপুত্তুর, কোটালপুত্তুর ছিল, ছিল ব্যসন

বিলাস, চাকচিক্য, মণি, রত্ন, বাবুয়ানী, শৌখিনতা। আর ছিল মেজাজ। যে মেজাজ ছিল রাজা, সম্রাট, নবাব, বাদশা জমিদারদের গর্ব আর তস্য তস্য উলু-খাগড়াদের চোখ টাটানো, মন মাতানো, নয়ন ঝলকানো ছবি। তাই এই বাঁশবনে স্বরি উলুবনের অধিবাসীরাই বা কম যাবেন কেন? হোক না, এ দেশ মীরজাফর-এর জন্ম দিয়েছে, তাই বলে কি সবাই মীরজাফর হবে? তাহলে 'মীরজাফর কে আলাদা করে চিনব কি করে? তাই সিরাজউদ্দৌলাও থাকবে, আলো আছে বলেই অন্ধকারকে চেনা যায়, আবার অন্ধকার আছে বলেই আলোকে। তাই সিরাজ থাকলে তবে মীর কে চিনব, মীর কে দিয়ে চিনব সিরাজকে। যাই হোক, উলুখাগড়ার দেশে নবাব পুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র সবাই মিলে মিশে জমা হলেন তেপান্তরের ধূ-ধূ করা মাঠে। সেখান থেকে হাতে হাত মিলিয়ে বেঙ্গমা বেঙ্গমীর মুখের বকম বকম এর ভাষা উদ্ধার করে গুপ্তমন্ত্র সম্বল করে এগোবেন তাঁরা। যেতেই হবে সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে রাক্ষসীর প্রাণ ভোমরা ছিনিয়ে নিতে। কাজেই এ যে সে যুদ্ধ নয়, এ যুদ্ধ প্রাণের তাগিদে। জিতলে এক পক্ষের রাজৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি আর অন্যপক্ষের প্রতিষ্ঠা রক্ষা। হারলে সে বড় ঝামেলা। বৃটিশ রাজশক্তির অগ্রগতি স্তব্ধ হবে অথবা আর এক পক্ষকে অন্যের পদাবনত হয়ে থেকে মুষ্টিভিক্ষা নিয়ে বেঁচে থাকবে। শেষেরটা হলে এতদিনের প্রাচ্য সংস্কৃতি ধা খাবে, এর মুন্সীয়ানা বনেদীয়ানা, আভিজাত্য যাবে শেষ হয়ে। তাই লড়াই প্রাণপণ। রামের সীতা উদ্ধারের লড়াই কিংবা কুরুক্ষেত্রের উপপ্রান্তে দুর্যোধনের শেষ প্রচেষ্টা, গদার মাধ্যমে কোনটাই কম ছিল না। কথা সাহিত্যের প্রান্তসীমা ছাড়িয়ে ইতিহাসে পৌঁছে গেল যুদ্ধ। তবু ইতিহাস একে কেন যুদ্ধ বলে স্থান দিল না সেই অর্থে, এনিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। শুধুই বিদ্রোহ নামাঙ্কিত হয়ে রইল। কেন? কেবলমাত্র একজন সিপাই প্রথমে এই স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে ছিলেন বলে একে সেই মর্য্যাদা দেওয়া হল না—নাকি, সংহত দেশের রূপ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি বলেই এই প্রাপ্য দেওয়া হল না? বিতর্কের কাজ ঐতি-হাসিকের, বুদ্ধিজীবীর –আমি শুধু ঘটনার কথকতা করি। এ যুদ্ধ গণযুদ্ধ নয় ঠিকই, কোন সমাজ সংস্কার বা দেশের পরিকাঠামোর পরিবর্তনের জন্যেও এ যুদ্ধের সূচনা হয়নি –কিন্তু তবু ব্যক্তিগতভাবে আমি একে বিদ্রোহ বলে আখ্যাত করতে রাজী নই। দেশের সুনির্দ্দিষ্ট সরকারের প্রতি জনগণের কোন অংশের ক্ষোভের প্রকাশকে বিদ্রোহ বলে; আর সেই বিদ্রোহের উদ্দেশ্য যদি হয়, সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক গঠন প্রকৃতির কোন পরিবর্তন, তাহলে তাকে বিপ্লব বলা চলে। যুদ্ধ হয় এক দেশীয় শক্তির সাথে অন্য কোন দেশীয় শক্তির

আমার নিজস্ব মত, প্রকাশের ভঙ্গি প্রাথমিকস্তরে বিক্ষোভ বা বিদ্রোহ কথাটিকে যথার্থ দান করতে পারলেও পরের দিকে, অর্থাৎ সংগঠিত বাধার অগ্রগতির সময়ে, এই প্রতিরোধকে যুদ্ধ আখ্যা দেওয়াই সমীচীন হবে। আমার ধারণা, যুদ্ধ না বলে এই প্রতিরোধ এবং প্রত্যাঘাতকে ঐতিহাসিকরা যথোপযুক্ত মর্যাদা দেন নি। ভারতবর্ষের ইতিহাসের এটা ছিল একটা গৌরবান্বিত অধ্যায়। নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ, বিলাস-ব্যসন, ভোগকেই যাঁরা মোক্ষ বলে মনে করতেন, একত্রিত হওয়ার বাসনা তাঁদের খণ্ডছিন্ন ভাবে থেকে থাকলেও তাকে সংহত রূপ দেওয়ার ক্ষমতা ত াঁদের কারুরই ছিল না। তবু, স্বীকার না করে উপায় নেই, সংগঠিত প্রতিরোধের এই বোধহয় সূচনা ভারতবর্ষের ইতিহাসে-- ভারতবর্ষ নামক একটা দেশের মানচিত্রকে গঠন তৈরী করার ব্যাপারেও। হর্ষবর্ধনের পরে সম্ভবত এই আবার নতুন প্রচেষ্টা, দীর্ঘ ব্যবধানে। সে ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র। ঘটনা বিন্যাসে, লেখার ধরতাইয়ে যদি পরে কখনও চলে আসে, তখন বলব।

যে কথা উঠেছিল এবং যে গল্প করতে করতে অন্য প্রসঙ্গে কখন চলে এসেছিলাম, ঠাহর হয় নি। এখন খেয়াল পড়ছে, বলতে বসেছিলাম রাম-নগরের রাজার গল্প। ব্যক্তিগত রাজ-জীবনের রহস্য রোমাঞ্চ অতিক্রম করেও এঁনার অন্য কীর্তিগাথা ভারতের সে সময়ের ইতিহাসে গভীরভাবে দাগ কেটে আছে। বিদ্রোহ বা বিপ্লবকে যুদ্ধের স্তরে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে যাঁর অবদান ইতিহাসের গবেষক ছাড়াও স্মরণ করেন আরও অনেকে, তাঁরা হলেন, অযোধ্যা, লক্ষ্মৌ এবং বেনারস বা কাশীর পরবর্তী প্রজন্মেরা। মূল্যবোধ সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে ঠিকই, পাল্টে গেছে কাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে, কোন ঘটনাকে কতটা মাপের দাগে বসানো হবে, সে সম্বন্ধে মননশীলতা। তবু, চারণগাথা বলে একটা কথা আছে জানো তো? সেই মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা, সিন্ধু সভ্যতা বা বৈদিক সভ্যতার সময় থেকেই হোক বা চীনে মাঞ্চুরাজার আমল থেকেই হোক আর কনফুসিয়াসের আমল থেকেই হোক, মধ্যপ্রাচ্যে রাজা হেরোড, যোসেফ, মেরী বা ঈশ্বরের পুত্রের সময় থেকেই হোক কিংবা ভূমধ্যসাগরের বুকে হেলে থাকা সাইপ্রাস, টিরোলের উপকথার সময় থেকেই হোক কিংবা রোমান ও গ্রীক সভ্যতার সময় থেকেই হোক, লোকের মুখে মুখে চলে থাকে অনেক গল্প, অনেক ঘটনা। অনেক ভাবৈশ্বর্য্য। সন্দেহ নেই, পরিবর্তনের বহতায় মাধ্যমের, সাথে সাথে কথাও অনেকটা বদলে যেতে পারে, কিন্তু বদলায় না সুর, বদলায় না অনুভূতির

আবেশ। তাই অনেক সময়ই ভূর্জপত্রে বা তালপাতায় বা শিলালিপিতে বা বইতে লেখা না থাকলেও তা বয়ে যায় বাপ-ঠাকুরদার বা মা-ঠাকুমার বলা গল্পে, চারণকবির গানে, বাউলের একতারার সুরে। এরকমভাবেই অনেক অলেখা ইতিহাস, ও ইতিহাস হয়ে ধরা হয়ে থাকে এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে। আবার অনেক সময় ইতিহাস হয়ে যায় গল্প অথবা গল্প, ইতিহাস। অর্থাৎ কিনা, অনেক সময়ই গল্প আর ঘটনার সরু সীমারেখা এতই সরু হয়ে থাকে যে দুইকে-আলাদা ভাবে দেখতে পাওয়া যায় না। আনুষ্ঠানিক উত্তর নয়, চিঠির পিঠে চিঠি লিখতে এবং পেতে, দুই-ই খু উ-ব ভালো লাগে। বিশেষ করে, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য না নিয়ে, কোন বিশেষ কথা জানাতে না বসে, কোন বিশেষ প্রশ্নের উত্তর না দিতে বেশ একটা ভালো লাগার শির-শিরানি গা দিয়ে বেয়ে যায়। কেননা, অনুষ্ঠানের পর্ব বাদ দিয়ে কাগজ-কলম নিয়ে বসলে ঠিক 'চিঠি' কথাটার অনুভূতি আক্ষরিক অর্থে থাকে না। সীমিত পরিধির বাইরে গিয়ে তখন সেটা কথা বলা-য় পরিণত হয়। আনন্দ সেখানেই। 'না জানি বাঁধন-বোধন, ওরে, তুই আমারি ও-মন'—বোষ্টম ঠাকুরটির এই ভাবই আসল। আর সেই আসলকে পেয়ে গেলে, মানে পেতে পারলে, আনন্দ তো হবেই। 'আমি জাগিয়া জাগিয়া, উ··ঠিয়া বসি। হিয়ার মাঝে তুই/আমার গয়া-কাশী,' এ আনন্দ বড় কামনার ধন। বোষ্টম ঠাকুরটি কপালে চন্দন-তিলক কেটে হাতে খঞ্জনি বাজিয়ে ভোরের বেলায় নিকানো আঙিনায় বোষ্টমীর সদ্য তুলে আনা ফুল গানের সুরে, মনের ভাবে নিবেদন করে সবার কাম্য কেষ্টঠাকুরটিকে—কে জানে, তখন তিনি বৃন্দাবনে না গোকুলে, নিধুবনে না রাসের লীলায়। না কি নৌকাবিহারে তা তিনি যেখানেই থাকুন, ভক্তের নিবেদন তাঁর কাছে ঠিক পৌঁছে যায়। আবার সেই একই আর্তি সহজিয়ার একতারার বোলে। ভুবনডাঙার বাউল গেয়ে চলে। নিবেদন, না আকুতি! দুই-ই। অন্তত প্রাপ্য বা কাম্য অর্থের বিচারে তো তাই-ই। আকুতি না থাকলে নিবেদনে আনন্দ নেই, পূর্ণ-তা নেই। আবার নিবেদন না থাকলে আকুতি জন্মায় না। পরস্পর পরিপূরক। একে-অন্যকে পূর্ণ করে। ঠিক একই জিনিষ, শ্রদ্ধা আর ভালবাসায়। দুয়ের সমন্বয় পূর্ণ করে জীবনকে, মাধুর্য আনে সম্পর্কে। সম্পর্ক মধুর হলে তবে আসে সম্ভোগ। সম্ভোগেই তৃপ্তি। হে নারী, তুমি আমায় গ্রহণ করো, তোমার নরম উপত্যকায় আমায় স্থান দাও, তোমার উরুসন্ধিতে আমাকে আঁকতে দাও গভীর স্বাক্ষর। আমায় তৃপ্তি দাও, বিবশ শরীরে পুনর্বার শিহরণ আনো, কারণ, চাঞ্চল্যই জীবনের লক্ষণ। মৃত্যু নয়, জীবন-ই কাম্য হওয়া

উচিত। তাই আমি চাঞ্চল্য চাই। তবে অচঞ্চল স্থবির জীবনের তুলনায় ভালো নিশ্চয়ই মহাশূন্যের 'কালো-গহ্বর' হওয়া, এবং কখনও, একদা, সুক্ষণে 'বিশাল আওয়াজ' (Big Bang) করে নতুন সৃষ্টির মাঝে জেগে ওঠা। তবু, কামনা থেকে যায়, কিছু না পাওয়ার থেকেও একটু কিছু পেয়েও শান্তি পেতে ইচ্ছে করে।

অধ্যায়—১০

সত্যি অনেকদিন কিন্তু লিখি নি। আমিই বলেছিলাম, মাঝে মাঝেই লিখব—অন্তত তা হলে মনটা শান্ত হবে। আজকাল যে কি সব হয়েছে, নিজের মনের ভেতর টুকরো টুকরো ছবি জোড়া লাগিয়ে একটা পূর্ণদৈর্ঘ্যের ঘটনাচিত্র তৈরি করে উপভোগ করতে ভীষণ-ই ভালো লাগে। এ ঘটনাচিত্র আজকালের টেলিফিল্মের মতই পর্বে বিভক্ত। তবে কর্তাব্যক্তিদের বেঁধে দেওয়া নির্দিষ্ট সংখ্যা নয়। বরং অগাধ স্বাধীনতা। প্রতি মুহূর্তেই নতুন রূপ, নতুন বাঁক—আদি অনন্ত পথ বেয়ে চলা ভীষণ স্রোত। সেই 'শুদ্ধ নীল আকাশের দৃশ্য অন্তহীন পটভূমি / চক্ষুর সীমানা প্রান্তে বেঁধে দিয়ে তুমি / এঁকে দিলে মাঠ বন বৃষ্টি মগ্ন নদী—তার দূরাভাস তীর / আমাকে নিঃশেষে দিলে তোমার একান্ত মৃদু মাটির শরীর, অথবা, এযেন নদীর মতো, নতুন দৃশ্যের শোভা প্রতি বাঁকে বাঁকে। তোমাকে বলেছিলাম না, অনুবাদের কাজ শেষ হয়ে গেলেই আমার ছুটি—অন্তত ভীষণভাবেই ছুটি পেতে ইচ্ছে করছে। ছুটি মানে নিরালম্ব বিশ্রাম, কিন্তু 'নিরালম্বন' নয়। ছায়ায় কায়ায়, স্বপ্নে জাগরণে হিল্লোলে বিল্লোলে আশ্লেষে বিশ্লেষে স্পর্শে, স্পর্শের কামনায় আমার অবলম্বন সেই তুমি ; বলেছিলাম, এবার শুধু পড়ব আর তোমাকে লিখব। বিশ্বাস হারিও না, আমার উপর। লিখতে চাইছিলাম। আর লিখতে চেয়ে মন যেমন টুপ করে আর এক সত্তার মাঝে ডুবে যায়, আমার অবস্থাও হল তাই। তোমাকে লিখব বলে নয়, লিখতে বসলেই আমার অপরূপ তুমি কি যে এক যাদু নিয়ে আমার চোখের সামনেটিতে অনেক রঙা বাহারী প্রজাপতিটির মতো ফুটে ওঠ, তাকে তখন দেখতেই ভালো লাগে। দেখতে দেখতেই বুঁদ হয়ে পড়ি, দেখে দেখে আশ মেটে না। এ ঘোর আমার কাছে এক পরম বিস্ময় পরল আদরের মহামূল্যবান পুঁতি সত্যি বলছি, এ সৌন্দর্য নিজের মন ভরে দেখতে মন এ অনাস্বাদিত শিহরণ মনের গভীর থেকে আরও গভীরে ছড়িয়ে পড়ছে, আমার ঋজু শাল অশ্বত্থের শিকড়ে শিকড়ে যত ক্ষুধা তা মাটির পরতে পরতে ছড়িয়ে গিয়ে সব সুধারস টেনে আনছে। মনে পড়ে যাচ্ছে, আমার সেই গুরুর কথা, না কি, সাধুবাবার

কথা। একটা বিশেষ মুহূর্তে কি জানি কি মাহেন্দ্রক্ষণ ছিল তা, আমার কাঁধ ছুঁয়ে বলেছিলেন মনটাকে সংহত কর। সংহত করা ল্যাবরেটরীতে শিখেছি, পদার্থবিদ্যা রসায়নের পুঁথির আখরে দেখেছি। মনের অনু পরমাণুতে জোটবদ্ধ করার vander waal's force বা crystal force চিনতাম না। বোধহয় কেউই নিজের থেকে তা খুঁজে নিতে পারে না, যতক্ষণ না অনেক দূরের অথচ অনেক কাছের কোন বিরাট শক্তি তা মনের মধ্যে induce করতে পারে। আজ ভাবলেই ভালো লাগে, মনের পর্দায় ফুটে ওঠা রূপের মধ্যে নিজেকে সংবাহিত ও আবিষ্ট হতে দেখলে মনে হয়, এই সেই সংহত রূপ। আ-হা-রে, রূপ-সাগরে আমার মন মজে। সে রূপ থেকে চোখ সরিয়ে কাগজে কলম ধরতে গেলে মন টানটান হয়ে ওঠে, চোখ সরাতে ইচ্ছেই করে না। লাগে স্পর্শ-উষ্ণ হাওয়া / দেখি চক্ষু ভ'রে / সূর্যমুখীর মতো মেলে আছো সেই এক অপরূপ ভোরে। সেই সব মুহূর্তগুলিতে আমারও প্রার্থনা থাকে 'দাঁড়াও ক্ষণিক তুমি কালচিহ্ন ভবিষ্য অপার / হৃৎস্পন্দে দাও আলো-উৎসের ঝংকার। 'শিয়রেতে ক্লান্তিহীন' তোমার দৃষ্টি আমাকে আচ্ছন্ন করে—আমাকে ভোগ করতে দাও সেই গহীন রূপে গভীর কিছু খুঁজে বার করতে। এ খুঁজতে আমার লাগবে না কোন ইমপোর্টেড বাইনোকুলার—ও তো পার্থিব কিছু স্পষ্ট করে দেখতে। অপার্থিব কিছু পার্থিব চোখ ভরে দেখার মতো দিন যাঁকে ঈশ্বর দিয়েইছেন, তার তো ওসব কিছু লাগবে না। এখন ও রূপ আমার সমস্ত শরীরে মিশে—বিন্দু বিন্দু রক্ত অবশেষে। ওঁ ভূঃ, ওঁ দুঃখ ওঁ ছায়া, ওঁ কাম, ওঁ স্বর্গ । শান্তিনিকেতন কোন ত্রিভুবনে নেই—আমি চাই নদীর গর্ভের মতো গভীরতা, হে উষ্ণ দেবদূতী, শিউলির বোঁটার রং যেন শুধু শিউলির বোঁটার মত ই হয়। তবু এই অন্তের আনন্দের অনুভূতিতেও লাগে তাতার দস্যুর মতো বাস্তব ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনি। তখনই আবার মন হয় অন্যমনস্ক, বড় নিষ্ঠুর সে দৌড়, সে ভয়াবহতার পদধ্বনি। যখনই মনে হয়, অনেক কিছু খেয়েও ভাতটাই খাওয়া হলো না, তখনই পেট যেন ভরে না। তারে বাবা, বাঙালী তো! ভাত না হলে পেট ভরে না, তাই কিছু পেলেও আসলটা দিতে না পারার হীনমন্যতায় যখন ভুগি, তখনই মন চঞ্চল হয়ে ওঠে, সবকিছুই বিস্বাদ লাগে। পুরুষ হয়ে তোমাকে টানলাম, তোমার যা দেয় তা তুমি প্রাণভরে দিয়ে গেলে, অথচ আমি তো পারলাম না তোমাকে আসল জিনিষটুকু দিতে। সে ব্যর্থতার বেদনা আমাকে ভীষণ কষ্ট দেয়। ধিক্কারে তর্কে আমার চিন্তাজালকে খণ্ডিত করে, 'ভারাক্রান্ত করি রাখে রাজদণ্ডমোর'। তখন বিষাদ আমাকে ছেয়ে ফেলে। তখন শুধু মনে হয়,

বাহু থেকে শীতের উত্তাপ যে রকম অপর বুকের কাছে ঋণী হয়, সেরকম আমি শুধু ঋণীই থেকে যাব তোমার কাছে। হে আমার অবলম্বন, আমার হাত ধরো, স্বর্গে যাবো। তোমার কষ্ট কি অবহেলায় তুমি মনে পুষে রাখো, সাময়িক ধৈর্য্যচ্যুতিতে হয়তো কখনও বা তা আমার উপর আঘাত হয়ে ফিরে আসে, শুধুই আমার নিজের গড়া আঘাতকে আরও বাড়িয়ে দিতে। আসলে আমি তো তা বুঝি। তোমার মত সুন্দর পবিত্র মন ও সমর্পণ বাস্তব পৃথিবীতে আমি দেখিনি, শুনিও নি। আসলে তুমি তো নবীনা পাতার মতো শুদ্ধরূপ তুমি স্বাতী নক্ষত্রের সেই প্রবাদমাখানো অশ্রু। জানো, প্রবাদটা জানো তো? প্রবাদ না গল্প কথা? বোধ হয়, প্রবাদই। গল্প তো শুধু বলার জন্যে, আর কিছু গল্প এমনই কোন চিরন্তন সত্যের ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে থাকে যে তা যুগের পর যুগ ধরে বেঁচে থাকে। তখনই তা প্রবাদ। এ ফুরোয় না, কালকে জয় করে কালের অবক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত তার দীর্ঘায়ু। চিরন্তন তাই প্রবাদের বৈশিষ্ট্য। হে আমার কামনার ধন, আমার হাত ধরো, আমি স্বর্গে যাবো। যদি নির্বাসন দাও আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরী ছোঁয়াবো— আমি বিষপান করে মরে যাবো। তবে যমুনা-ই হও, আর স্বাতী-ই ও কিংবা অরুন্ধতি ই হও, নিজেকে কান্নার সাগরে নিঃসঙ্গ মনে করো না। অ্যালিস যখন সেই আশ্চর্যদেশে গিয়েছিল, মনে আছে তো? খরগোশের পেছনে দৌড়তে দৌড়তে তাকে ধরতে না পারলেও সে হাজির হল এক অবাক দেশে। দুধ খেয়ে হয়ে যায় ভীষণ ছোট, আবার কেক খেয়ে হয়ে যায় ঠিক সাইজের। এই সাইজটাই তো সব। ওটা ঠিক হলে তবেই না পাওয়া যাবে চাবিকাঠিটি। তা সে যাই হোক, অ্যালিস পিছলে পড়লো চোখের জলের ধারায় তৈরী হয়ে যাওয়া বিরাট পুকুরটিতে। হঠাৎই ছাগলছানার চামড়া দিয়ে তৈরী গ্লাভস্ পরে তো সে কোন রকমে বাঁচল। তো সেই গ্লাভস্‌টাই দরকার। আমিও সেটা পেয়ে গেছি তোমার মাঝে। তাই 'আমিও অপ্রেম থেকে ফিরে এসে, অরুন্ধতি, তোমার চোখের অশ্রুপান করি'। অরুন্ধতি, আলো হও, আলো করো, আলো আলো / অরুন্ধতি আলো / চোখের টর্চলাইট নয়, বুকে আলো, অরুন্ধতি, / লাইট হাউস হয়ে দাঁড়াবে না?'

রূপ দেখে ভুলি কী রূপের বান / তোমার রূপের তুলনা কে দেবে? / এমন মূঢ় নেই কেউ, চক্ষু ফেরাও, চক্ষু ফেরাও / চোখে চোখে যদি বিদ্যুৎ জ্বলে কে বাঁচাবে তবে? —বটের ভীষণ শিকড়ের মতো শরীরের রস নিতে লোভ হয়। শরীরে অমন সুষমা খুলো না / চক্ষু ফেরাও, চক্ষু ফেরাও!

তবু কেন অবিশ্বাস গ্রাস করে? অথবা হয়তো বা অবিশ্বাস নয়, নিছকই ভয়। আরে ভয় তো সহজাত. তবু, অবিশ্বাসের কাজ তো কিছু করিনি। তাহলেও ভয় করে। কিন্তু তখনই আবার কল উল্টো দিকে চলে, তাহলে আমিই কি বিশ্বাস প্রতিস্থাপন করতে পারিনি? আমি শুধু জোর করে বলতে পারি, পথ ভুল হয়নি / ঠাণ্ডা চাবিটা পকেট / বন্ধ দরজার সামনে থেমে / তিনবার নিজের নাম ধরে ডাকবো, এবং তৎক্ষণাৎ সুইচ / এলোমেলো অন্ধকার সরিয়ে / আয়নায় নিজের মুখ চিনে নিয়ে বারান্দা পেরিয়ে ঢুকবো ঘরে। এই অনুভূতিটাই এসেছিল. যেদিন প্রথম প্রতীক্ষারত তোমাকে দেখেছিলাম, লম্বা উঠান পেরিয়ে যাবার পথে বাঁকের মুখে হঠাৎই মনে হয়েছিল, অন্ধকার পেরিয়ে চাবি খুলে এবার ঘরে ঢুকবো। যা চেয়েছিলাম আমি তা পেয়েছি।